চালৈন

তঞ্চঙ্গ্যা শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা



প্রকাশনায়
চালৈন প্রকাশনা পর্ষদ
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ

চাৌলৈন

তনচংগ্যা শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা

সম্পাদক
আদিলাল তঞ্চঙ্গ্যা

প্রকাশনায়
চাৌলৈন প্রকাশনা পর্ষদ
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ

চাক্ষৈন

বিষু- ১৪২৪ বাংলা, ২০১৭ খ্রীস্টাব্দ
পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, (বিষু সংখ্যা)

সম্পাদক

আদিলাল তঞ্চঙ্গ্যা
সদস্য-সদস্যা
রাঙামাটি সরকারি কলেজের
অধ্যয়নের সকল তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র/ছাত্রী

সহযোগিতায়

জগদীশ তঞ্চঙ্গ্যা	রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ
সুজন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা	রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ
লক্ষী সাগর তঞ্চঙ্গ্যা	রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ
সাধন তঞ্চঙ্গ্যা	রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ
অরুন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
চৈনিকা তঞ্চঙ্গ্যা	বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ
দিবাকর তঞ্চঙ্গ্যা	সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম মহানগর
নিক্সন তঞ্চঙ্গ্যা	জাতীয় কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা
কালায়ন তঞ্চঙ্গ্যা	বান্দরবান সরকারি কলেজ
চৈতেঅং তঞ্চঙ্গ্যা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
রিনি তঞ্চঙ্গ্যা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
কল্প রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা	কর্ণফুলী ডিগ্রী কলেজ
জবা তঞ্চঙ্গ্যা	রাঙ্গামাটি সরকারি মহিলা কলেজ
ধনরাজ তঞ্চঙ্গ্যা	রাজস্থলী কলেজ
রাহুল তঞ্চঙ্গ্যা	রাঙ্গামাটি পাবলিক কলেজ
অঙ্কন তঞ্চঙ্গ্যা	মানিকছড়ি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট

প্রচ্ছদ

জানন তঞ্চঙ্গ্যা ও জগদীশ তঞ্চঙ্গ্যা

ডিজাইন ও মুদ্রণে
সীবলী অফসেট প্রেস, কাকলী মার্কেট
কাঠালতলী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা'
ফোন: ০৩৫১-৬১৮৮২

শুভেচ্ছা মূল্য ১২০/-
ছাত্র-ছাত্রী- ৬০/-

সম্পাদকীয়

শুরুতে জানাই সকলকে বাংলা নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও "বিষুর" অভিনন্দন। বিষুর মাধ্যমে আমরা পুরাতন বছরকে বিদায় জানায় এবং সেই সাথে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। যাতে সারা বছর সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারি এবং দেশের ও জাতির উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারি এমন প্রত্যাশা কামনা করে থাকি। তাই নতুন বছরের প্রথম দিনে বা পহেলা বৈশাখ এর দিনে রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজের অধ্যয়নরত সকল তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দ্যেগে নিজেদের শিক্ষা, সাহিত্য, সাংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের মেধা ও সৃজনশীলতার প্রকাশ করার উদ্দ্যেশ্যে আমাদের এই "চাɑলৈন" প্রকাশনা ক্ষুদ্র প্রয়াস। এই 'চাɑলৈন' প্রকাশনা শুধু রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজের সীমাবদ্ধ নয়, এটি সারা বাংলাদেশের এবং দেশের বাইরের দেশেও। এই "চাɑলৈন" প্রকাশনাটি অধ্যয়নরত সকল তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র-ছাত্রীদে মেধা, সৃজনশীলতা, আত্ম-প্রকাশ করার জন্য প্রত্যেক বছর অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। নানা সীমাবদ্ধতার বাধাঁ পেরিয়ে সুধীজনের ঐকান্তিক সাহায্য-সহযোগীতার প্রকাশনাটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত।

যাঁরা আমাদের এই প্রকাশনার জন্য মূল্যবান লেখা, সময়, শ্রম, বিজ্ঞানপন এবং অর্থ দিয়ে সহযোগীতা করেছেন আমরা তাদের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আর যাদের লেখা ইচ্ছা থাকার সত্ত্বেও সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা ছাপাতে পারিনি সেই জন্য, দুঃখ প্রকাশ করছি।

আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট চেষ্টার সত্ত্বে ও ভূল ত্রুটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। আশাকরি ভূল-ত্রুটিগুলো পাঠক মহল ক্ষমা ও সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আগামীতে কিভাবে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দিবেন। আবারও সকলকে "চাɑলৈন" প্রকাশনা পক্ষ থেকে- ১৪২৪ বাংলা নববর্ষ ও বিষুর শুভেচ্ছা রইল।

আদিলাল তঞ্চঙ্গ্যা
সম্পাদক
চাɑলৈন প্রকাশনা পর্ষদ
রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ
রাঙ্গামাটি।

কৃতিত্বের অবদান ও সম্মাননা

২০১৭ ইং সনে জেলা শিল্পকলা একাডেমী রাঙামাটি আয়োজিত চারুকলায় সামগ্রিক অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ শ্রী রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর গুনীজন সম্মাননা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে মহিলা বিষয়ক সংসদ সদস্যা, চেয়ারম্যান রাঙামাটি জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসক রাঙামাটি, পুলিশ সুপার উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা ১৯৮১ ইং সনে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংবর্ধনা লাভ করেন। বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউটের ব্যবস্থাপনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক সচিব ড: রণজিত কুমার বিশ্বাস ২০১৫ ইং সনে চারুশিল্পে অনন্য অবদানের জন্য আজীবন সম্মাননা প্রদান করেন।

তাঁর অপ্রতিদ্বন্ধী কর্মকৃতিত্ব ও সেবার জন্য জাতি গর্বিত এবং চাৗলন প্রকাশনা এইজন্য নন্দিত ব্যক্তিকে স্মরণ করবে।

চাৗলন প্রকাশনা পর্ষদ

সূচীপত্র

সূচীপত্র

উৎসব-বিষু উৎসব-বাংলা নববর্ষ

অনির্বাণ বড়ুয়া

উৎসব সবসময় আনন্দের। উৎসবে আনন্দের প্রকাশ ঘটে। সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য-মিলনের উপলক্ষ উৎসব। যে-কোনো উৎসব আমাদেরকে দেয় অনাবিল খুশি, নিয়ে আসে শান্তির পরশ। শান্তি ও ঐক্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি হয় উৎসবে যা সবার যোগে পূর্ণতা পায়। এখানে সবাই অংশ নিতে চায়- অংশীদার হতে চায় আনন্দ-উচ্ছ্বাসের। এর জন্য মানুষ অনেক আগ্রহ আর আবেগ নিয়ে অপেক্ষা করে কখন এসে উপস্থিত হবে কাঙ্ক্ষিত অনুষ্ঠান। মানুষ সহজাতভাবেই আনন্দের উপলক্ষ তথা সুখের সময়টাকেই বেশি ধরে রাখতে চায়- কাছে পেতে চায়। যে-কোনো মানুষের কাছে আনন্দই বেশি প্রিয়- বেশি উপভোগ্য। আর এই উৎসবে মানুষ আনন্দ করার সুযোগ পায় বেশি। উৎসব উপলক্ষেই সকলে একত্রিত হতে পারে। কাজেই উৎসবের একটি সর্বজনীন আবেদন আছে।

যেহেতু উৎসব মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে যুক্ত তাই ইহা মানুষের খুব কাছের। ইহা অত্যন্ত জীবন-ঘনিষ্ট। জীবনের কোনো না কোনো সময় উৎসব এসে উপস্থিত হয়। উৎসব-অনুষ্ঠান আয়োজনও তার সহজাত। উৎসব-আয়োজন না করে সে থাকতে পারে না। এর প্রতি আকর্ষণ তার অত্যন্ত স্বভাবজাত। কোনো না কোনো উপলক্ষেই সে অনুষ্ঠান করে থাকে। এখানে তার একটি নিখাদ তৃপ্তি আছে। উৎসব মৈত্রীর বন্ধন তৈরি করে। উৎসবের মাধ্যমেই সবার মধ্যে অনাবিল অবারিত আনন্দের উদ্বেলিত অভিপ্রকাশ ঘটে-সবাই ভাগ করে নেয় আনন্দ। সত্যিই মানুষ উৎসবমুখর ও উৎসবপ্রিয় প্রাণী। মানুষের জীবনাচারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উৎসব-অনুষ্ঠান। কখনো সেটা আড়ম্বর আবার কখনো অনাড়ম্বর। উৎসব মানুষের জীবনে ছিল, আছে এবং থাকবে। তাই উৎসবের আবেদন সবসময় প্রাসঙ্গিক। এর মাহাত্ম্য সর্বকালিক-সর্বদৈশিক। মুক্তির অভিজ্ঞান উৎসবের কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী-পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষের এই উৎসব। সকল মানুষের জীবনকে গতি দানকারী উৎসবে সবাই একত্রিত হতে পারে, একজন আরেকজনের খোঁজখবর নিতে পারে। যোগ দিতে পারে ঐকান্তিক উৎসাহ, আগ্রহ আর আবেগ নিয়ে। এই উৎসব মানুষের অফুরন্ত প্রেরণার উৎস যার দ্বারা সে শুভ চেতনায় সমৃদ্ধ হয়; লাভ করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রাণশক্তি ও দেখতে পায় সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন।

কালের পরিক্রমায় বিশ্ব-জাগতিক নিয়মে একটি বছর শেষে আরেকটি বছর সমাগত হয়। ঐ বছরটিও মহাকালের গর্ভে হারিয়ে যায়; আরেকটি বছর আসে। এটিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

অমোঘ বিধি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই একটি বছরের শেষে আরেকটি বছরের আগমনকে কেন্দ্র করে উদ্‌যাপিত হয় নববর্ষ। এই নববর্ষ উৎসবের বিভিন্ন নাম আছে বিভিন্ন দেশে। যেমন- বাংলাদেশের নববর্ষ উৎসবের নাম পহেলা বৈশাখ। বৈশাখ বাংলা বছরের প্রথম মাস। নববর্ষকে স্বাগত জানানোর জন্য বর্ণিল সমারোহপূর্ণ যে আয়োজন তা-ই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের তথা বাঙালির বর্ষবরণ অনুষ্ঠান পহেলা বৈশাখ এদেশের আবহমান কালের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য-সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইহা বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির এক প্রধান অনুষঙ্গও বটে। বাঙালি জীবনাচারের সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে মিশে আছে বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। এ আয়োজনের সাথে কাল বা সময়ের সম্পর্কটি সবচেয়ে বড়।

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আসল মর্ম হচ্ছে শুভবোধ আর মঙ্গল প্রত্যাশা। এই চেতনা সবার জন্য প্রযোজ্য। কাজেই নববর্ষের একটি সর্বজনীন তাৎপর্য আছে। আমাদের জীবনে ও সংস্কৃতিতে নববর্ষের রয়েছে বড়ো একটি প্রভাব। শুভ কামনা শুধু নিজের জন্য নয়, সকলের জন্য। আমাদের উত্তরকালে যারা আসবে তাদের জন্যও মঙ্গল চাওয়া। নিজের উন্নতি-সমৃদ্ধি আর কল্যাণ কামনার পাশাপাশি অপরের জন্য কল্যাণ চিন্তার মাধ্যমে আমাদের সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতি সম্ভব। এর মাধ্যমে সবার জীবনে সুখ-শান্তি-কল্যাণ আসতে পারে। নববর্ষ আমাদেরকে সেই মানবিক মঙ্গলবোধে জাগ্রত করে-উদ্দীপ্ত করে সর্বজনীন কল্যাণ চেতনায়। নববর্ষ উৎসব বাঙালির জাতীয় উৎসব। সবাই অংশ নেয় এ আয়োজনে; আনন্দে মেতে উঠে একসাথে। এদিন সবাই দুঃখ ভুলে অপার আনন্দ-উল্লাসে মুখরিত হয়ে উঠে; একাত্ম হয় একে অপরের সাথে।

নববর্ষ উৎসব বর্ষ পরিক্রমার আরম্ভের সূচক। তাই এ অনুষ্ঠান আমাদের চিত্তলোকে জাগায় নতুন আশা; নিয়ে আসে নতুনের বার্তা; সঞ্চার করে নতুন সাহস; যোগায় নতুন জীবনের প্রেরণা আর দেখায় নতুন স্বপ্ন। সবার সম্মিলন, নবজীবন ও শুভবোধের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আমাদের মধ্যে সার্বজনীন আদর্শের যে চেতনা জাগায় তা থেকে আমরা পাই জীবন-উপলব্ধির এক পবিত্র শক্তি। জীবনকে নবরূপে সাজাতে, অতীতের সকল ভুলভ্রান্তি শুধরে নিয়ে, সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার প্রত্যয়ে, আলোকিত আগামীর আকাঙ্ক্ষার অমিত শক্তি যোগায় নববর্ষ উৎসব। সকল জীর্ণতা, অবসাদ, গ্লানিকে ফেলে দিয়ে নতুন সূর্যালোকে স্নাত হয়ে নব-উদ্দীপনায় সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ করে দেয় বর্ষবরণ। শুভবোধে উজ্জীবিত হয়ে ভবিষ্যতে জীবনকে সর্বাত্মক সুন্দরভাবে চালিত করার দৃপ্ত শপথ গ্রহণের এক অনুপম মাহেন্দ্রক্ষণ ইহা। কাজেই নববর্ষ আমাদেরকে শুভবোধ আর মঙ্গল-চেতনা

শানিত করার পাশাপাশি নবজীবনে বেঁচে থাকার এক অবারিত দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। এ আমাদের জন্য এক পরম প্রাপ্তি।

বাংলা নববর্ষ বাংলাদেশের একটি সামাজিক উৎসব। এর বহুমাত্রিক গুরুত্ব আছে। পুরো জাতিকে একত্রে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত করে বাংলা বর্ষবরণের এই উৎসব। ইহা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির পরম এক ঐশ্বর্য যা আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যকে ঋদ্ধ করেছে। এ উৎসবের প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক ও মানবিক তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। এ অনুষ্ঠান একটি সামষ্টিক প্রপঞ্চও বটে। নববর্ষ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেভাবে সকল ধর্মের, বর্ণের, গোত্রের, শ্রেণী-পেশার মানুষ সম্মিলিত হয় তেমনটা আর কোনো অনুষ্ঠানে দেখা যায় না। দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সকলের হৃদয়ে নববর্ষের বর্ণিল আয়োজন দোলা দিয়ে যায়- ঘটায় এক ব্যঞ্জনাময় অনুরণন। খুব কম অনুষ্ঠানই পারে এভাবে সকল মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে। সুতরাং নববর্ষ সত্যিই আনন্দের, আবেগের, অনুভবের, উপভোগের, উপলব্ধির।

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল ও সমতলের আদিবাসীরাও বর্ষবরণ উৎসব পালন থাকে মহাসমারোহে, বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায়। বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের সময় অর্থাৎ পহেলা বৈশাখের সময় তারাও নতুন বছরকে বরণ করে বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান উদযাপনের মধ্যে দিয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠী সমূহের মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা নৃ-গোষ্ঠী অন্যতম। তঞ্চঙ্গ্যাদের বর্ষবরণ উৎসব হচ্ছে 'বিষু উৎসব'। চাকমাদের বিজু, মারমাদের সাংগ্রাইং, ত্রিপুরাদের বৈসুক ইত্যাদি। বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন বলি আর আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠী সমূহের নববর্ষ উদ্‌যাপন বলি, বর্ষবরণের সব উৎসবেরই আবেদন এবং মাহাত্ম্য প্রায় একই। এসব অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন হলেও এদের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট সাদৃশ্য। উৎসবগুলো পালনের রীতি-রেওয়াজ, পদ্ধতি, চেতনা ও ভাবনায় অনেক মিল লক্ষণীয়।

বিষু উৎসবের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। সবার মতো তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর মানুষও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা-আড়ম্বরতার সাথে বিষু উদ্‌যাপন করে। নতুন বছরকে স্বাগত জানায় নতুন আশায়, নতুন উদ্দীপনায়। সবাই জেগে উঠে নতুন প্রত্যাশায়; নতুন বছরের নতুন স্বপ্নে বুক বাঁধে। পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, শহরে, জনপদে সবাই উৎসবের আমেজে মেতে উঠে। সবদিকে উৎসবের উল্লাস। সবাই আনন্দে ভাসে উৎসবমুখর পরিবেশে। চারিদিকে অনুষ্ঠান আয়োজনের আবহ। তিন দিন ধরে চলে বিষু। এর অনেক আগে থেকেই চলতে থাকে উৎসবের প্রস্তুতি আর আয়োজন। বিষুর দিন সবাই আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি সবার বাড়িতে যায়। আলাদা করে নিমন্ত্রণ করার

প্রয়োজন পড়ে না। সবাই নতুন জামা-কাপড় বেড়াতে বের হয়। নানা পদের উন্নত খাবার তৈরি ও পরিবেশন করা হয়। বিভিন্ন ধরনের পিঠা-পায়েশ বানানো হয়। শিশুরা বেশি আনন্দে মেতে উঠে। তারা বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে আসে আশীর্বাদ নিতে। ছেলেমেয়েরা ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ফুল নিয়ে আসে এবং ঘরবাড়ি সাজিয়ে তোলে। এই মহৎ আয়োজনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ঘরবাড়ি পরিষ্কার করার কাজ তো চলেই। ঘরের সব জিনিসপত্র ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়। উষ্ণ আতিথেয়তা চলে। অতিথি আপ্যায়ন চলে অনেক সমারোহে। বিষু উৎসবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। নতুন বছরের প্রথম দিন দেশ-জাতি-সমাজ-মানুষ সবার জন্য মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনায় বিভিন্ন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাও সম্পন্ন করা হয় বর্ণাঢ্য আয়োজনে। এদিন বুদ্ধমূর্তি স্নান, বুদ্ধপূজা, সীবলীপূজা, সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান, ফানুস উড়ানো, সূত্রপাঠ সহ বৌদ্ধ পর্বানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে। বৌদ্ধ বিহারগুলোকে বর্ণিল সাজে সাজানো হয়; করা হয় আলোকসজ্জাও। বর্ষবরণের সব আয়োজনেই নবজীবনের তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয়; পরিচয় পাওয়া যায় শুভ চেতনার।

বিষু উদ্‌যাপনের অনেক বিষয়ের সাথে ব্যাপক মিল আছে বাংলা নববর্ষের। উৎসবের রীতি-রেওয়াজ, উপলক্ষ, উদ্‌যাপনের ধরন আর গুরুত্বের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য আছে অনেক। আমরা মনে করি, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বর্ষবরণ উৎসব বাংলাদেশের হাজার বছরের আবহমান সংস্কৃতি ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বর্ষবরণের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাঙালি সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক-একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আদিবাসী বর্ষবরণ উৎসব প্রকৃতই আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের অহংকার। বাংলা নববর্ষের মতো বিষু উৎসবও আমাদের সবাইকে কাছে আনে; তৈরি করে হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের বন্ধন; বাড়ায় প্রীতি ও আন্তরিকতা। এ উৎসব মানুষের মধ্যে সাম্যের আদর্শকে জাগিয়ে তোলে। মানুষকে উদার করে, সহজ করে দেয়, নিয়ে যায় ন্যায়-নীতি এবং সত্যের পথে। এ অনুষ্ঠান আরো ভালোভাবে পালনের জন্য দরকার সবার সহযোগিতা; প্রয়োজন সরকারি সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা। এর ঐতিহ্যিক দিকগুলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় রাখা জরুরি।

নববর্ষ সেটা যে জনগোষ্ঠীর হোক না কেন ইহা জাতীয় ঐক্য, মৈত্রী, সম্প্রীতি, সাম্য ও দেশাত্মবোধের পরিচায়ক। বর্ষবরণ উৎসব আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রতীক- আমাদের অহংকার। আমাদের আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরম ঐশ্বর্য নববর্ষ উৎসব থেকে আমরা পাই আত্ম-অন্বেষণ, আত্ম-অনুসন্ধান ও আত্ম-বিশ্লেষণের শিক্ষা- পাই শেকড়ের

সন্ধানের প্রেরণা। আমাদের হাজার বছরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ধারক-বাহক নববর্ষ উৎসব মানুষে মানুষে মিলনের যে অপূর্ব মেলবন্ধন সৃষ্টি করে দেয় তা মানুষকে মানুষরূপে জানতে শেখায়, চিনতে শেখায়, বুঝতে শেখায়। মানুষকে আন্তরিকতার বন্ধনে আবদ্ধ করে। ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও মানবতার সেতুবন্ধন রচনা করে। আজকের বাস্তবতায় এ উৎসব আমাদের সকলের জীবনে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এর আবেদন আমাদের কাছে শাশ্বত। নববর্ষ উৎসব মানবতারই জয়গান করে। আমাদেরকে সত্যিই মানবীয় হওয়ার পথ দেখায় ইহজাগতিক জীবনের সাথে অত্যন্ত সাযুজ্যপূর্ণ এ আয়োজন। নববর্ষ যেমন আমাদের জাতীয় উৎসব, বিষু উৎসবও তা-ই। দেয়া-নেয়া-মিলানো-মিলনের শিক্ষা দেয় নববর্ষ। মানুষে মানুষে হৃদতা আর মিলন সৃষ্টির এমন বৃহত্তর উপলক্ষ আর তেমন একটা নেই। এর মধ্যে দিয়ে আমাদের মধ্যে যে মানবিক চেতনাবোধের উন্মেষ ঘটে তা আমাদেরকে নবজীবনে বাঁচতে শেখায়;আলোর পথ দেখায় সামনের দিকে এগিয়ে যেতে; সাহস সঞ্চার করে ন্যায়-সত্য-সততার পথে চলতে। একটি সুন্দর, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, উন্নত-সমৃদ্ধ, শোষণ-বৈষম্যহীন, উদারনৈতিক, মানবিক সমাজ বিনির্মাণে নববর্ষ ও বিষুর প্রয়োজন অনেক বেশি। এ উৎসব থেকে আমরা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের বলিষ্ঠ শপথ নিতে পারি।

পরিশেষে কামনা করি- আমাদের প্রতিটি বিষু আর পহেলা বৈশাখ হোক সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য, জাতীয় সংহতি, ন্যায়-সততা-শুভবোধ, আর শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার আনন্দময় কর্মসূ-চ। এ উৎসব হোক সবার জীবনচলার অনুপ্রেরণার অফুরান উৎসভূমি। সকল জরা আর জীর্ণতা দূর হয়ে নতুন দিনের নতুন সূর্যালোকে আলোকিত হোক সকলের জীবন। নতুন আশায় নতুন স্বপ্নে উদ্দীপ্ত হোক সকলে। সবার জীবনে ধ্বনিত হোক মানবতার জয়গান। মানবিক সমাজের মধুর দ্যোতনায় দ্যোতিত হোক মানুষের হৃদয়। আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উৎসবগুলো সকলের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্র হয়ে উঠুক- পরিণত হোক সর্বমানবের মিলনক্ষেত্রে। উৎসব হয়ে উঠুক সকল মানুষের প্রাণময় আত্মিক মিলনের শুভ উপলক্ষ। উৎসবের আলোয় উদ্ভাসিত হোক দেশ, জাতি, সমাজ আর মানুষ। কবিগুরুর ভাষায় বলতে চাই-

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষেরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক ॥
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক ॥
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।

*[অনির্বাণ বড়ুয়া : সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ,
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ, রাঙ্গামাটি।]*

তন্‌চংগ্যাদের প্রচলিত খেলাধুলা

কর্মধন তন্‌চংগ্যা

ভূমিকাঃ বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী তথা তন্‌চংগ্যাদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির উপকরণের মধ্যে খেলাধুলা একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। এইসব খেলাধুলার মধ্যে রয়েছে তাদের সংস্কৃতির নিজস্বতা, পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশে বসবাসরত সব আদিবাসী জনগোষ্ঠীও এই বৈচিত্র্যতা লালন এবং ধারণ করে। তবে কিছু খেলাধুলা আছে সব আদিবাসীদের মধ্যে সাদৃশ্যের পাশাপাশি বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। আবার কিছু খেলাধুলা আছে আদিবাসী তথা তন্‌চংগ্যা এবং সমতলীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ঐক্যতা এনে দিয়েছে। যে খেলাগুলি গ্রাম বাংলার মানুষের মাঝে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ ঐক্যশ্রী করে রেখেছে বহুকাল ধরে। সেরকম কিছু তন্‌চংগ্যাদের নিজস্ব খেলাধুলা আর সাধারণ সবার কাছে জনপ্রিয় এবং পরিচিত কিছু খেলাধুলা নিম্মে আলোচনা করা হলো- ঘিলা খেলা, গাত্তয়া খেলা, ঢাংগুলি খেলা, শামুক খেলা, গআং খেলা, দু-দু খেলা, বাঘ দাইত খেলা, লুআ লু-ই খেলা, ইচিবিচি খেলা, চাড়া খেলা, শিল খেলা, বুদ্ধিবুদ্ধি খেলা, টুম্বুল খেলা, জোড়-বিজোড় খেলা,সই খেলা, গুলিক খেলা, তেদই বিচি খেলা।

১. ঘিলা খেলা

ঘিলা খেলা তন্‌চংগ্যাদের জাতীয় খেলা। তার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত অন্যান্য আদিবাসীরাও এই খেলাটি খেলে থাকে, বিশেষ করে চাকমারা। এই 'ঘিলা খেলা' তন্‌চংগ্যাদের কাছে শুধু একটি খেলা নয় এটি তন্‌চংগ্যাদের সংস্কৃতির একটি অংশও। এই ঘিলাকে কেন্দ্র করে তন্‌চংগ্যা সমাজে পবিত্র একটা বিশ্বাস আছে এবং উভাগীতের নানা পালা আছে যা তন্‌চংগ্যাদের জাতিগত পরিচয় ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে ধারণ করে। 'ঘিলা পারা পালা' নামে একটি উভাগীতের পালা আছে যেখানে সেই সময়ের যুবক-যুবতীদের ঘিলা ঠাক সংগ্রহ করতে যাওয়ার মধ্যে যে একটা আনন্দঘন মুহূর্ত তাদের মনে উকি মারে এবং ধারণ করে সেসবের একটা রসময় বর্ণনা আছে এই ঘিলা পারা(সংগ্রহ) পালাতে। তাছাড়া তন্‌চংগ্যা সমাজে জনশ্রুতি আছে ঘিলাফুল দেবংশী বস্তু(অদৃশ্য বস্তু) এবং যে এই ঘিলাফুলকে দেখে সে রাজা/রাণী হয় বা বড় কিছু হয়ে যায়। আবার অনেকে বলে এই ফুল দেখলে অঘটনও ঘটতে পারে পরিবারে, সমাজে বা দেশে। তাই মঙ্গল এবং অমঙ্গলের চিহ্ন বহন করে এই ঘিলাফুল। এই ঘিলা খেলা দিনে এবং সন্ধ্যায় খেলা হয় বেশী করে। বিশেষ করে গ্রামে, যেখানে সারাদিনের ক্লান্তকে একটু আনন্দে ভরে দিতে সন্ধ্যা সময় এই খেলা আয়োজন করা হয়। তবে দিনের চেয়ে রাতের আবহটা একটু বেশী প্রাণবন্ত এবং আনন্দদায়ক। কারণ তখন একটু একটু ঠান্ডা হিমেল হাওয়া ও সারাদিনের ক্লান্তকে সাথী করে এই খেলা তাদের বাড়তি আনন্দ দেয়। দাদারা বলতেন পুরনো দিনে প্রায় প্রতিটি গ্রামে এবং পাড়ায় এই ঘিলা খেলা আয়োজন করা হতো। তবে বিষুর সময় আয়োজনটা হতো সবসময় নতুন এবং মজার আনন্দ আর প্রাণবন্ত। কারণ বিষু সাথে

নতুন বছরের এবং নতুন জীবনের হাতছানি আর নতুন জুমের কাজে হাত দেওয়ার আনন্দ বাড়তি অনুপ্রেরণা জোগাত এই ঘিলা খেলাকে। ঘিলা খেলার নির্দিষ্ট কোন বয়স না থাকলেও যুবক-যুবতীদের বাড়তি আনন্দ এবং অনুপ্রেরণা দিত সবসময়। ঘিলা খেলা আনন্দঘন এবং প্রতিযোগীতামূলক করে তোলার জন্য গ্রামের মধ্যে যুবক-যুবতী বা যুবক-যুবক বা যুবতী-যুবতী বা যুবক/যুবতী-মাঙগোইন(যারা বিয়ে বরেছে) বা মাঙগোইন-মাঙগোইন এর মধ্যে এই খেলা চলত। আবার অনেক সময় এক গ্রামের সাথে অন্য গ্রামের বা পাড়ার মধ্যে ঘিলা খেলা চলত। অনেক সময় বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধারাও তাদের অতীত স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে নামত দু-একটা পর্ব খেলার জন্য। ঘিলা খেলার নিদির্ষ্ট কোন খেলোয়াড়ের সংখ্যা নির্ধারণ করা থাকে না। তবে একটি দলে ৪/৫ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে খেলাকে সময় এবং এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা প্রাণবন্ত যোগসূত্র তৈরী করা যায়। আবার অনেক সময় আয়োজনকারীদের মতামতের ভিত্তিতে খেলোয়াড়ের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। ঘিলা খেলার সময় ঘিলা নির্বাচনও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গোলাকার এবং অবন্ধুর ঘিলা একজন খেলোয়াড়কে বাড়তি সুবিধা এনে দেয়, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য। ঘিলা খেলার জন্য সমান এবং উমুক্ত জায়গা সবচেয়ে উপযুক্ত। ঘিলা খেলার জন্য ৫/১০/১১/১৫ অনেক সময় ২০ ফুটের দুরত্ব নির্ধারণ করা হয়। তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে দুরত্ব একটু কম, তাদের সুবিধা মতো। ঘিলা খেলা শুরু করার দুই/এক-দিন আগে থেকে খেলার স্থানকে উপযুক্ত করে তোলা হয়। সেজন্য খেলার কমিটি বা যুবক-যুবতীরা সবাই মিলে নির্ধারিত স্থানকে ঘষা মাজা করে খেলা উপযোগী করা হয়। অনেক সময় গোবর দিয়েও খেলার স্থানকে উপযুক্ত করে তোলা হয়। খেলা আশেপাশে ঝোপঝাড়ও পরিস্কার করা হয় যাতে ঘিলাটি দ্রুতগতিতে যাওয়াটি ঘিলাটি সহজে পাওয়া যায়। ঘিলা খেলার সময় উভয় দলে যেহেতু সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে তখন সিদ্ধান্ত হয় কে কাকে আঘাত করবে। এখানে আঘাত করতে বা লক্ষ্যবস্তু পরিণত হওয়া অর্থ হচ্ছে উক্ত পর্বের জন্য সে মরে যাওয়া বা তার মেয়াদ সমাপ্ত হওয়া। তন্চংগ্যা সমাজে ঘিলা খেলার বেশ কয়েকটি পর্ব আছে। সেগুলি হল- কুচুক, টুক্যা/গলা কুচুক, আদুনদি/হাটু বাঁকা, কআন ব্যাঙ বা হাদুভাঙা(হাটু ভাঙ্গা), লুক্ কদই বা পায়ের চুক, সেপ দি কুচুক(সেঁ সুক), ভাত মচা, দোয়াসিক ইত্যাদি। তবে স্থান এবং গছা বিশেষ এর নাম আলাদা আলাদা আর পর্ব সংখ্যাও কম-বেশী লক্ষ্য করা যায়।

খেলার নিয়মাবলী ঃ

ক. কু-চুক/বড় কু-চুক ঃ ঘিলাকে সরাসরি মাটিতে ইরি (ছেড়ে) দিয়ে (ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলের সাহায্যে) চাকার মতো ঘুরতে ঘুরতে রেঞ্জের মধ্যে থামিয়ে পরে দুই হাতের সাহায্যে যেকোন একটি হাতের তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে প্রতিদ্বন্ধীর খাড়া বা সোজা অবস্থায় পেতে রাখা (পানি বা থুথু দিয়ে একটু গর্ত করে) ঘিলাকে মেরে স্থানচ্যূত করা হয়। দলের কেউ যদি প্রথমবার যদি প্রতিপক্ষ ঘিলাকে স্থানচ্যুত করতে না পারে তাহলে দলের কেউ তাকে সাহায্য করতে পারে। তবে নির্দিষ্ট পর্ব সম্পূর্ণ না হওয়ার আগে নতুন পর্বে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই, সেটি প্রত্যেক পর্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটি

একসাথে প্রতিপক্ষের জন্য সব ঘিলা পেতে রাখা হবে। তারপর প্রতিপক্ষ একজন একজন করে প্রতিপক্ষের ঘিলাকে স্থানচ্যুত করার চেষ্টা করবে প্রথম পর্বে যদি সবার শেষে দ্বিতীয় দল প্রথম দলের মতো একই নিয়মে মারবে।

খ. **টুক্যা বা গলা কুচুক ঃ** গলার নিচে ঘিলাটা আড়া-আড়িভাবে রেখে রেঞ্জের মধ্যে ছেড়ে প্রতিপক্ষের পুটে রাখা ঘিলা বরাবর মারতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে ঘিলাটি গলা থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর যেখানে গিয়ে থামতে সেখান থেকেই ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলের সাহায্যে প্রতিদ্বন্ধীর পাতানো ঘিলার দিকে লক্ষ্য করে মারতে হবে। প্রথমবার লক্ষ্যচ্যুত হলে আরো ২/১ বার সুযোগ পাওয়া যায়।

গ. **আদুন-দি বা হাটু বাঁকা ঃ** হাটু বাঁকা করে মারতে হয় এই পর্বে। হাটু বাঁকা করে অর্ধবসা অবস্থয়ায় এই পর্বটি খেলতে হয়। ঘিলাটি দুই হাটুঁর মাঝখানে রেখে অর্ধবসা অবস্থায় জোরে একটি লাফ দিতে হয়। এই লাফে যতটুকু যাওয়ায় যায় তারপর ঘিলাটি হাটুঁ থেকে ছেড়ে গিয়ে গড়িয়ে যেখানে গিয়ে থামবে বা থামানো যায় সেখান থেকে নির্দিষ্ট ঘিলাকে লক্ষ্য করে মারতে হবে। তবে এক লাফে যদি ঘিলাটি পুটে দেওয়া ঘিলাগুলিকে অতিক্রম করে চলে যায় তাহলে উক্ত পর্বের জন্য সে আর মারতে পারবে না, উক্ত পর্বের জন্য সে বাদ পড়বে।

ঘ. **কঅনাব্যাঙ বা হাদু ভাঁ (হাটু ভাঙ্গা) ঃ** দুই পায়ের হাটুর মাঝখানে রেখে এক লাফ দিয়ে ঘিলাকে ছেড়ে দিয়ে রেঞ্জের মধ্যে যেখানে থামবে সেখান থেকে আঙ্গুল দিয়ে প্রতিদ্বন্ধীর পাতানো ঘিলাকে মারতে হবে। কোন অবস্থায় দুই বা তিন লাফ দেওয়া যাবে না। দুই হাটুঁর মাঝখানে যাতে ঘিলাটি লেগে থাকে সেজন্য অনেক সময় থুথু বা পানি ব্যবহার করে একটু আঠালো করা হয়, যাতে ঘিলাটি সহজে হাটুর সাথে লেগে বা লেপ্টে থাকে।

ঙ. **লুক কদই বা টেঁঅ চুক ঃ** পায়ের পাতার কাছাকাছি দুই পায়ের মাঝখানে পায়ের ঘিলা বার চোখের মাঝে রেখে একলাপ দিয়ে রেঞ্জের মধ্যে ঘিলাটি ছেড়ে দিয়ে, যেখানে ঘিলাটি থামবে সেখান থেকে প্রতিদ্বন্ধির পুটে রাখা বা পাতানো ঘিলাকে লক্ষ্য করে মারতে হবে। লক্ষ্যচ্যুত হলে দুই বা একবার সুযোগ পাওয়া যাবে তার বেশী নয়।

চ. **হাক্কা মু / আউ-ল ফা চুক ঃ** পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের মধ্যে দিয়ে রেঞ্জের মধ্যে ঘিলাটি ছেড়ে দিয়ে ঘিলাটি যেখানে গিয়ে থামবে সেখান থেকেই তর্জনীর সাহায্যে প্রতিপক্ষের পুতে রাখা বা পাতানো ঘিলাকে লক্ষ্য করে মারতে হবে। প্রথম বার লক্ষ্য সফল হলে ভালো পরবর্তীতেও দুই/একবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

ছ. **চেবরাঙ বা টেঁঅ পাদা সেপদি কু-চুক ঃ** ঘিলার এক পার্শ্বে থুতু লাগিয়ে বা দিয়ে সামনে দিকে প্রতিপক্ষের পাতানোর ঘিলার দিকে চ্যাপ্টা করে ছুড়ে মারতে হবে। তবে ছুড়ে মারাটা অবশ্যই রেঞ্জের ভিতর থাকতে হবে প্রতিপক্ষের পাতানো ঘিলা সীমাকে অতিক্রম করা যাবে না। আর ঘিলাটি এমনভাবে ছুড়ে মারতে হবে উপরে

দেওয়া থুথুটি যেন ঘিলার চ্যাপ্টার উপর থাকে। সেটি যদি মাটির সাথে ল্যাপ্টে থাকে তাহলে সে প্রতিপক্ষকে আঘাত করার বা মারার অযোগ্য হিসেবে গন্য হবে। মারা আগে অবশ্যই প্রতিপক্ষকে থুথুটি দেখাতে হবে। মানে ঘিলাটি যে উল্টে যায়নি তার প্রমাণ দিতে হবে এভাবে দেখিয়ে।

জ. **ভাত মচা ঃ** মুরগী লড়াইয়ের মতো এক লাফ দিয়ে রেঞ্জের মতো পাতানো ঘিলাকে আঘাত করা। এই এক লাফের মধ্যে যদি ঘিলাটি কোন কারণে প্রতিপক্ষের পাতানো ঘিলাকে অতিক্রম করে তবে সে প্রতিপক্ষকে আঘাত করার অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঝ. **দোয়াসিক ঃ** আঙ্গুলের একটু উপরে বা পায়ের পাতার উপরে রেখে থুথু বা পানি দিয়ে ঘিলাকে বসিয়ে (যেন সহজে পা থেকে পড়ে যেতে না পারে)নির্ধারিত প্রতিদ্বন্দ্বির ঘিলাকে আঘাত করা বা মারা হয় এই পর্বের মাধ্যমে। এই পর্বের মাধ্যমে জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়। মানে এই দোয়াসিক পর্ব হচ্ছে ঘিলা খেলার সমাপনী পর্ব। এই পর্বে মোট তিনটি পর্ব অতিক্রম করতে হয়। স্থান বিশেষে এগুলিকে বদ জাম, মৃদু জাম, চিঅন জাম আবার গদা,কআ এবং আদাইও বলা হয়।

২. নাদিঙ/ নাদেঙ খেলা

নাদিঙ খেলা (লাটিম খেলা) তন্‌চংগ্যাদের অন্যতম দ্বিতীয় প্রধান খেলা। নাদিঙ খেলা যেটি বাংলায় লাটিম খেলা বলা হয় তবু বাংলায় যে লাটিম খেলা তন্‌চংগ্যাদের নাদিঙখে-লার মধ্যে রয়েছে বিস্তর বৈসাদৃশ্য। তন্‌চংগ্যারা যে নাদিঙ খেলা খেলে সেটি তাদের নিজস্ব আদলে এবং পছন্দ মোতাবেক তৈরী করা হয়। যত ভালো গাছের হবে তত নাদিং এর গ্রহন যোগ্যতা, স্থায়িত্ব এবং গুনগতমান তত বেশী মজবুত হবে। পুসুমিরী নামের একটি গাছের লাটিম তন্‌চংগ্যা সমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে। কারণ এই গাছের নাদেঙ খুব মজবুত এবং শক্ত হয়, যা প্রতিপক্ষকে সহজে ঘায়েল করা যায়। গোঙ গাছের নাদিঙ বা নাদেঙও বেশ জনপ্রিয় তন্‌চংগ্যা সমাজে। নাদেঙকে ওজন এবং উপযুক্ত করে তোলার জন্য অনেক সময় পেক্কয়্যা (কাদা) মাটিতে পুটে রাখা হয়। যেন নাদেঙটি খেলার মাঠে অপ্রতিদ্বন্ধিভাবে লড়াই করতে পারে। নাদেঙ খেলার জন্য দরকার অন্যতম তিনটি জিনিস, সেটি হলো সমান উম্মুক্ত মাঠ, নাদেঙ এবং দড়ি। নাদেঙ খেলার জন্য সমান মাঠ না হলে খেলা তেমন জমে না। নাদেঙ খেলার দড়িটি সাধারণত পেচানো আর লম্বায় হয় ২/৩ হাত তবে খেলার দঁড়িটি লম্বা বেটে করা যায় নিজের সুবিধা বা পছন্দ মতো।

নাদেঙ খেলা খেলার নিয়ম ঃ নাদেঙ খেলা খেলার ক্ষেত্রে দলগত এবং এককভাবে মিলে খেলা যায়। দল এবং এককভাবে খেলার মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের সাথে বৈচিত্র্যগত পার্থক্য রয়েছে। তবে উভয় খেলার মধ্যে মজার নির্জাসটা অভিন্ন। একক এর চেয়ে দলীয়গত খেলার সময়টা একটু দীর্ঘ হয়। এককভাবে খেললে একজন লাটিমটি গুরিয়ে দিবে আর অন্যরা তা আঘাত করার চেষ্টা করবে। আঘাত করার পর, যার আঘাতে

লাটিমটি গুরা বন্ধ হয়ে যাবে সে পরবর্তীতে তাকে আবার আঘাত করতে পারবে। পরবর্তীতে আঘাত করার পর আবার যদি লাটিমটি মরে যায় তবে তাকে আবার তার জন্য লাটিমটি গুরিয়ে দিতে হবে, তন্‌চংগ্যারা একে 'ছ' (বাচ্চা) পাওয়া বলে। প্রথমবার ঘুরিয়ে দেওয়ার সময় যদি একজন উক্ত লাটিমকে মেরে ফেলতে পারে তবে তাকে আবার পূনরায় যারা আগে মারতে পারেনি তাদের জন্য গুরিয়ে দিতে হয়। এভাবে যে প্রথমবার লাটিমটি গুরিয়ে দিবে কেউ যদি তাকে মারতে না পারে তবে ধারাবাহিকভাবে তার পরের জন একিই দায়িত্ব পালন করবে।

৩. টুম্বুল খেলা

এই খেলা মূলতঃ যাদু বিদ্যা খেলা আর খেলে থাকেন সাধারণত বৈদ্য এবং কবিরাজরা। ছোটকাল থেকে শুনে এসেছি এই খেলা একদিকে মজার হলেও ভয়ংকরও খুব। কারণ এই খেলায় যে দুজন খেলোয়াড় খেলবে তারা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য নানা ভয়ংকর যাদু বিদ্যা প্রর্দশন করেন। এই যাদু বিদ্যার মধ্যে আছে মুরগী চালান, শুকর চালান, ব্যাঙ চালান, তলোই বনা চালান ইত্যাদি। এই খেলার মূলতঃ উভয়ে তাদের বিদ্যাকে যাচাই বা ঝালাই করার জন্য এই খেলা খেলে থাকে। আগে দিনে বিষু উপলক্ষে ঘিলা খেলা, নাদেঙ খেলার মতো এই খেলাও নিয়মিত হতো। পরবর্তীতে জীবন মরণের একটা ভয় বা ঝুঁকি থাকে বলে এবং খেলোয়াড়দের আগ্রহের কমতি কারণে এই খেলা আর হয় না। আগের কার দিনে টুম্বুল খেলা উপলক্ষে প্রত্যেক অঞ্চলে খবর প্রচার করা হতো কারা কারা এই খেলায় অংশ গ্রহন করবে। সেসময় এই বিষয়ে রাজা, মৌজা প্রধান হেডম্যান এবং গ্রাম প্রধান কার্বরীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। তবে এই খেলার বাইরেও অনেক সময় দুই জন বৈদ্য মিলে মজা করার জন্য এই খেলায় উর্ত্তীণ হতো বা কোন বৈদ্য যদি কো-ন একজন বৈদ্যের বাড়িতে বেড়াতে যেত তখন তারা মজা করার জন্য এই খেলায় লিপ্ত হতো। তখন একজন বৈদ্য আরো একজন বৈদ্যকে পানি পান করতে দেওয়ার সময় পানির গাসের মধ্যে একটা ব্যাগাচি ছেড়ে দিত, আর সে সময় যদি অতিথি বৈদ্য সে খেলায় দক্ষ হন তাহলে তিনি একটা মুরগী/মোরগ এনে সে ব্যাগাচিকে ছু মেরে নিয়ে যেত বা খেয়ে ফেলত। এভাবে খাবারের মধ্যে নানা পোকা-মাকড় ছেড়ে দিয়ে অতিথি বৈদ্যকে গৃহকর্তা মজা করতেন। ঠিক এভাবে যখন দুইজন বৈদ্য খেলার মাঠে এই খেলায় উর্ত্তীন হন, তখন তারা একে অপরকে ব্যাঙের মতো আচরণ করার জন্য ব্যাঙ চালান, তেমনি শুকরের মতো আচরণ করার জন্য শুকর চালান দিত, বানরের মতো আচরণ করার জন্য বানরের চালান দিত। বানরের চালান দিলে সে বানরের মতো আচরণ করতো এবং গাছের উপর উঠতো। আর শুকর চালান দিলে সে শুকুরের মতো মাটি আচড়াতো। তবে এই খেলার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর খেলা হলো 'তলোই বনা' খেলা। এই খেলা এই কারণে ভয়ংকর তাকে যদি তলোই বনা চালান দেওয়া হয় তখন সে তলোইকে গুচিয়ে রাখার মতো গোলাকার হওয়ার জন্য আচরণ করে। এই খেলার সময় কোন বৈদ্য যখন উক্ত যেকোন একটি চালান দেন তখন সে যদি উক্ত চালানটি বা মন্ত্রটি কাটাতে বা উদ্ধ্য করে

নিতে না পারেন তাহলে ভুক্তভোগী মৃত্যু বরণও করতে পারেন। কারণ যা যতক্ষণ পর্যন্ত মন্ত্রটি উদ্ধ্য করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই আচরণ করে যাবেন। আর সেসময় উৎসক জনতারা মজা পেতেন সে খেলা দেখে। পরবর্তীতে জীবনের ভয় এবং মানুষের আগ্রহ না থাকার কারণে সে খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

৪. গোল মরইত্ বা কুমির কুমির খেলা

গোল মরইত্ (গোল মরিচ) বা কুমির কুমির খেলা সাধারণ পানির মধ্যে খেলা হয়। এটি ছোট ছোট বাচ্চারা খেলে থাকে। এটি মজার সাথে কিছু সাবধানতাও আছে। কারণ এটি খেলার জন্য একটু গভীর মরঙ বা বড় কূয়ার প্রয়োজন হয়। সাথে খেতে হয় মা-বাবার বকাঝকা। কারণ এই খেলা খেলতে গিয়ে চোখ লাল হয়ে যায়। এটি খেলার সময় কোন দল বা উপদল থাকেনা। সবাই সবার প্রতিপক্ষ, সহযোদ্ধা। খেলার সময় সবাই মিলে একজনকে নির্বাচন করবে যে অন্যদেরকে খুজে বের করবে। তবে এই খুজতে হবে পানিতে ডুব দিয়ে কুমিরের মতো করে। তার আগে একজন যিনি কুমির হবে তাকে যেকোন একজন একটি আঙ্গুল উচু করে ধরে বলবে- 'ইবা কি ? সে বলবে - গোল মরইত্, গোল মরইচ বিদিরে কি ? সে বলবেঃ ল-আ, তারপর শেষে বলবে- মেরে এক ডুবানে ট-আ'। এই বলে যিনি কুমির হবেন তিনি ডুব দিয়ে অন্যদেরকে স্পষ্ট করতে চেষ্টা করবেন। এই ডুব দেওয়ার পর প্রথমে সে যাকে স্পষ্ট করবে সে পরবর্তী সময়ের জন্য কুমির হবে, যতক্ষণ না অন্য একজনকে সে স্পষ্ট করতে না পারছে। আর যারা এই কুমিরের ভয়ে পলায়ন করবে তাদেরও কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তাদের পলায়ন করার সময় এবং পানি থেকে উঠার সময় মনে রাখতে হবে তাদের হাটু যেন দেখা না যায় আর দেখা গেলে তাকে পরবর্তীতে কুমির সাজতে হবে। এক সাথে যদি একের অধিকজন এই ভুলটি করেন তাহলে ধারাবাহিকভাবে সবাইকে কুমির হতে হবে। তখন শুরুতে যিনি কুমির হয়েছেন তিনি কুমির হওয়া থেকে মুক্তি পাবেন। এইভাবে যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ পর্যন্ত এই খেলা যায়। এখানে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, অন্য খেলার মতো একজনের পর একজন কুমির হওয়ার সুযোগ নেই। কুমির হয়ে যিনি যাকে স্পর্শ করবেন তিনিই কুমির হবেন। খেলা অনুযায়ী যতবার তিনি স্পষ্ট হবেন।

৫. গাইত্ খেলা

এটি গাছ দিয়ে খেলা হয়। ২ ফুট লম্বার একটি গাছের টুকরো এই খেলার প্রধানতম উপকরণ। এই খেলা ২/৩ জনের মধ্যে খেলা হয়। এই গাছের টুকরোর একটি অংশে সচারু করা হয়। যেন সহজে মাটিতে পুতে বা আটকে যায় উপর থেকে মাটিতে আঘাত করার সাথে সাথে। খেলা শুরুর আগে কে আগে গাছটি মাটিতে পুতে দিবে নির্ধারণ করা হয়, তারপর সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিরিয়াল মেনে একে একে গাছটি মাটিতে পুতে দিতে হয়। আর অন্যরা তা আঘাত করবে। এভাবে প্রথমে একজন গাছটি মাটিতে পুতে দিবে তারপর অন্যরা একে একে তাকে আঘাত করবে। শুধু আঘাত করলে স্পর্শ করলে হবে না তাকে মাটিতে কপোকাত করতে হবে আঘাতের মাধ্যমে। আর আঘাতের মাধ্যমে গাছটি

মাটিতে পড়ে যায় তাহলে যিনি মেরেছেন তিনি পয়েন্ট লাভ করেছেন বলে গন্য হবেন। আর না পারলে পয়েন্ট শূন্য এবং তখন যিনি গাছটি মাটিতে পুতে দিয়েছিলেন তিনি পুতে রাখা থেকে মুক্তি পাবেন। এভাবে যে যতবার প্রতিপক্ষকে আঘাত করে মাটিতে ফেলতে পারবেন তিনি তত পয়েন্ট এর মালিক হবেন এবং তিনি বিজয়ী হবেন।

৬. সই খেলা

সই খেলা তন্‌চংগ্যাদের একটি জনপ্রিয় খেলা। এখানে 'সই' অর্থ হচ্ছে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত ,স্পষ্ট বা যেটিকে টার্গেট করা হয়। এটি সাধারণত শিল (পাথর) এবং কিছু টাকা (কাগজের কাল্পনিক টাকা) নিয়ে খেলা। এটি দলীয় কোন খেলা নই, একক খেলা। এই খেলা খেলার জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট একটি জায়গাকে কেন্দ্র হিসেবে ধরে নিয়ে সেখান থেকে এই খেলা শুরু করতে হয় আর এই কেন্দ্রের চিহ্ন হিসেবে একটি গর্ত করা হয়। এই খেলা সমতল বা পাহাড়ের ঢালু জায়গায় খেলা যায়। ঢালু জায়গার খেলার মধ্যে একটা কৌশল থেকে যায়, সেটি হচ্ছে এখানে সহজে জিটে যাওয়ার একটা সুযোগ থাকে। এই কৌশলের মধ্যে পাথর নির্বাচনও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ পাথরটি যখন কোন জায়গায় ছুড়ে মারা হয় সেটি যেন যেখানে বসাতে চাচ্ছি সেখানে গিয়ে বসে সে বিষয়টি খেয়াল রাখা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য পাথরটি নির্বাচন করার সময় ওজন, সাইজ, পাথরের কিনার ধারালো কিনা বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিবে কে আগে তার পাথরটি টার্গেট করার জন্য পাথাই (রেখে দেওয়া) দিবে মারার জন্য। যিনি পাথাই দিবেন(তিনি প্রথম ব্যক্তি) তাকে সবাই স্পষ্ট বা ছোয়াঁ বা আঘাত করার জন্য নিজের পাথর খন্ডটি দিয়ে লক্ষ্যবস্ত ঠিক করবে। তার আগে যিনি পাথরটি পাথাই দিয়েছেন তিনি বলবেন আঘাত করতে পারলে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিব, এটি হতে পারে ১০০/৫০০/১০০০ টাকা। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকাটা উঠানামা করে পাথর খন্ডটি ভালো জায়গায়(খাড়া বা সহজে স্পষ্ট করা যায় না এমন জায়গা) বসিয়ে দেওয়ার উপর। কারণ তাকে কেউ যদি স্পষ্ট করতে না পারে তাহলে সে উক্ত সমপরিমাণ টাকা পাবে সবার কাছ থেকে। যখন কেউ আঘাত বা স্পষ্ট বা ছুইতে পারবে না তখন সবাই পাথর পাথাই দেওয়ার ব্যক্তিকে তার চাওয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। আর স্পষ্ট করতে পারলে যিনি স্পষ্ট করতে পারবেন তাকে পাথর পাথাই দেওয়ার ব্যক্তির পক্ষ থেকে দিতে হয়, তবে অনেক সময় পাথাই দেওয়ার পাথর খন্ডের নির্দিষ্ট দুরুত্বে অবস্থানের ভিত্তিতেও টাকা দেওয়া ও নেওয়া উঠানামা করে। আবার কেউ যদি মনে করে যে তার পক্ষে পাথাই দেওয়া পাথর খন্ডটি স্পষ্ট বা আঘাত করা সম্ভব নয় তখন সে ঝুকি না নিয়ে উল্টো পাথর পাথাই দেওয়া ব্যক্তিকে বলে তুমি যদি আমার পাথরকে স্পষ্ট বা আঘাত করতে পা-র (তখন তার পাথর খন্ডটি কেন্দ্রে গর্তে রেখে দিবে) তাহলে তোমাকে তোমার চাওয়া দ্বিগুন অর্থ দেব। তখন প্রথম পাথর পাথাই দেওয়া লোকটি যদি স্পষ্ট বা আঘাত করে তবে সে অর্থ পাবে আর না পারলে দ্বিগুন অর্থ তাকে গুনতে হবে। এভাবে খেলতে গিয়ে যখন দলের একজনের কাছে সব অর্থ চলে আসবে তখন খেলা সমাপ্ত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। তবে একজন অপরজনকে টাকা ধার দেওয়ার মধ্যে দিয়ে খেলাকে অনেক সময় দীঘ হয়।

৭. গুলিক খেলা

মাটির তৈরী গুটি দিয়ে খেলা হয় বলে মূলত এটিকে তন্‌চংগ্যারা গুলিক খেলা বলে। বর্তমান সময়ে মাটির তৈরী গুটির পরিবর্তে মার্বেল দিয়ে এই খেলা, খেলা হয়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মূলত এই খেলা খেলে থাকে। গুলিক তৈরী করার জন্য প্রধানতম উপকরণ হচ্ছে কাদা মাটি যেটি তন্‌চংগ্যারা 'মইনা মাদি' অনেক সময় একে 'পেক্যা মাদি'ও বলা হয়। এই গুলিক খেলা নিয়ে ছোটকালে সবার কম-বেশী মজার মজার স্মৃতি আছে। গুলিক খেলা নিয়ে সহপাঠি বা প্রতিবেশীর ছেলে-মেয়েদের সাথেতো টুকটাক ঝগড়া লেগেই আছে আর মা-বাবা থেকেই তো অনেক বকা-ঝকা খেতে হয়েছে ছোট ভাই বা বোনকে রেখে এই খেলা খেলছি বলে। আর এই সুযোগে ভাই বা বোনটি কত কান্না। গুলিক তৈরীর প্রধানতম উপকরণ কাদা মাটি আমি আগেই বলেছি। মাটিকে প্রথমে পানি ছাড়া বা পানি দিয়ে ভালোমতো ময়দা মাখার মতো করে মেখে নিতে হবে। তারপর নিজের পছন্দ মতো সাইজ করে মার্বেল এর মতো গোলাকার করে গুটি তৈরী করতে হবে, গুটি বানানো শেষ হলে রোদে শুকাতে দিতে হবে। আর বর্ষাকাল যদি হয় খেলার মজা থেকে বঞ্চিত না হতে চালৈন বা খুলা দিয়ে আগুনের উপর শুকানো যায়। শীতকালে আগুন পুহানোর সময় আগুনের ভিতর পুড়ে নেওয়া যায় খুব সহজে। এখানে মনে রাখা ভালো মাটিটি যতবেশী মাখানো হবে গুটি গুলি তত বেশী টেকসই এবং শক্ত হবে। আবার এই গুটি গুলিকে দুটি স্তরে ভাগ করা হয়। প্রথম স্তরে হচ্ছে 'দাগ্নি' বা যিটির সাহায্যে গুটি লক্ষ্যবস্তু করা হয়, এটি আবার বিনিময় হয় না আর দ্বিতীয় স্তরের গুলি হচ্ছে সাধারণ গুটি, যেটি দেওয়া-নেওয়া এবং বিনিময় করা যায় এবং যাবে। এই গুলিক খেলার জন্য প্রথমে একটি সমতল জায়গা নির্বাচন করতে হবে। তারপর একক হিসেবে বা দল বেঁধে এই খেলা, খেলা যায়। প্রথমে জায়গা নির্বাচন করে নির্দিষ্ট দুরুত্বে ডান-বাম দিকে একটি রেখা বা দাগ টানতে হবে। এই রেখাটি বা দাগটি একধরণের 'শৃঙ্খলা জনিত নিয়ন্ত্রণ' রেখা। এই দাগের একটু দুরে থাকবে একটি ছোট্ট গর্ত, এটিও খেলাকে অনেকটা নিয়ন্ত্রন করে। তারপর সবাই একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে একটি একটি করে গুটি নির্দিষ্ট গর্তের দিকে মারবে। সবার লক্ষ্য থাকে গর্তের খুব কাছাকাছি যাওয়া বা ভাগ্য থাকলে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়া। কারণ গর্তের কাছাকাছি থাকার উপর অনেকটা খেলা নিজের মধ্যে নিয়ন্ত্রন রাখার একটা সুযোগ থাকে। আর যে যত বেশী গর্তের কাছাকাছি থাকবে গুটিগুলি মারার ক্ষেত্রে তত সামনে চলে আসবে। মানে ১,২,৩,৪,৫ জন খেলোয়াড় হলে তার সিড়িয়াল তত আগে চলে আসবে। আর যত আগে তত বেশী লাভ। কারণ প্রথম জন মারার পর সে যদি সবগুটি পেয়ে যায় তাহলেতো দ্বিতীয় জনের সুযোগ নাও আসতে পারে। তার মানে বাকীদের গুটি তখন লস্ট। গুলিক মারা সময় যদি একটি গুটি নির্দিষ্ট দাগ অতিক্রিম করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সে পর্বের জন্য সে অযোগ্য হবে। এরপর পরের জনের কাছে সিরিয়াল চলে যাবে। এভাবে সিরিয়ালভাবে মারার সিদ্ধান্ত হওয়ার পর সবাই মিলে ঠিক করবে কয়টা করে খেলার জন্য গুটি দিতে হবে। তারপর সিরিয়াল যার আগে পড়বে সে সব গুলিক নিয়ে দাগকে অতিক্রম করে মতো সব গুলিক ছুড়ে মারবে। সব গুলিক ছুড়ে

মারার পর কোন গুলিক যদি দাগ অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয় তাহলে উক্ত পর্বের জন্য সে মরে যাওয়া মানে বাদ পড়ার বলে গন্য হবে। গুলিক ছুড়ে মারার পর দাগ অতিক্রম করে যদি কোন গুলিক বা যতটা গুলিক গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়বে ততগুলি গুলিক তিনি প্রাপ্ত হবেন। তারপর দল থেকে কেউ একজন একটি গুলিক দেখিয়ে দিবে, তারপর যিনি মারবেন তার থেকে লক্ষ্য রাখতে হবে মারতে গিয়ে দেখিয়ে দেওয়া গুটিটি যেন না লাগে। আর লাগলে সে কোন গুলিক প্রাপ্ত হবেন না। যদি সেটি ছাড়া অন্য একটি গুটি লাগে আর কোন গুটি না লাগে তাহলে সব গুটি তিনি প্রাপ্ত হবেন। অনেক সময় নির্দিষ্ট একটি গুলিককে লক্ষ্য করে মারতে বলা হয়। দেখিয়ে দেওয়া গুলিককে যদি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা যায় তাহলে সব গুলিক সে পাবে। আবার অনেক সময় টার্গেট ঠিক না হলে ২/১ টা গুলিক বাড়তি ক্ষতি পূরণ দিতে হয়। এভাবে দেওয়া নেওয়া আর পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে দিয়ে গুলিক খেলা সমাপ্ত হয় যদি সব গুলিক একজনের হাতে এসে জমা হয়।

৮. গআঙ্ খেলা/ উন্‌ধুরা খেলা

সব বয়সের পুরুষ ও মহিলারা এ খেলা খেলতে পারেন। দুই দলে বিভক্ত হয়ে খেলতে হয়। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে উভয় পক্ষে মোট (৩+৩) ৬ জন হলে গআঙ্ খেলা খেলা যায়। খেলোয়ার থাকলে প্রতি দলে ৫ কিংবা ৭ জন করেও গঠন করে খেলা যায়।

উভয় পক্ষে পরস্পর বোঝাপড়া অথবা লটারীর মাধ্যমে স্থির করা হয় কোন দল প্রথমে আক্রমন শুরু করবে। তন্‌চংগ্যা ভাষায় আক্রমনকারী দলকে উচানী বা উপরের দল এবং প্রতিরক্ষাকারীকে পেদানী বা পেছনের দল বলে।

গআঙ্ শব্দের অর্থ সীমাবব্ধ ক্ষেত্র বা গন্ডিবদ্ধ। এটি মূলত গন্ডিবদ্ধ একটি খেলা। কারণ নির্দিষ্ট দাগ বা সীমার বাইরে কেউ যদি চলে যায় তাহলে সে স্বাভাবিক নিয়মে নির্দিষ্ট পর্বের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। একে তন্‌চংগ্যারা মারা যাওয়া বলে। সমতল স্থানে প্রতিটি ৬ দ্ধ ১২ বর্গফুট পরিমাপের পাশাপাশি কমপক্ষে তিনটি আয়তক্ষেত্র নিয়ে এ খেলার ক্ষেত্র বা গন্ডিবদ্ধ করা যায়। খেলোয়ারের সংখ্যা বেশী হলে সে অনুপাতে গআঙ বা আয়তক্ষেত্রের সংখ্যাও বাড়ানো হয়। প্রতি আয়তক্ষেত্রের মাঝখান দিয়ে একটি রেখা / দাগ টানা হয়। আয়তক্ষেত্রের ভিতর এবং এর দুপাশে কঞ্চি/ খুটি অথবা বাঁশ বা মাটি কুড়ে আবার অনেক সময় সাদা পাউডার দিয়ে সীমানা রেখা বা দাগ নির্ধারণ/চিহ্নিত করা হয়।

খেলার নিয়মাবলী ঃ

ক. উচানী দলের খেলোয়ারগণ গআঙের ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করবে। সীমারেখা অতিক্রম করার মুহূর্তে পেদানী দলের ক্ষেত্র রক্ষক (গআঙ রক্ষক) কিংবা দলনেতা (খেলাতে তাকে 'কুমীর' বলা হয়) তাকে স্পর্শ করলে সে তক্ষনাৎ বহিংকৃত বা মারা যাওয়া (তবে নির্দিষ্ট পর্বের জন্য) বলে গণ্য হবে।

খ. প্রতি গআঙ রক্ষকের দায়িত্ব থাকে নিজ ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থান করে তার সামনের সীমারেখা অতিক্রম করার সময়ে অনুপ্রবেশকারীকে স্পর্শ করা ।

গ. প্রতিপক্ষের খেলোয়ারকে স্পর্শ করার সময় অবশ্যই নির্দ্দিষ্ট সীমারেখার উপর এক পা রেখে হাত দিয়ে যতদূর পর্যন্ত নাগাল পাওয়া যায় প্রতিপক্ষকে স্পর্শ করার চেষ্টা করতে হবে। তবে প্রতিপক্ষকে স্পর্শ করার সময় যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রন করে রাখা না যায় প্রতিপক্ষকে স্পর্শ করলেও প্রতিপক্ষ মৃতবলে গন্য হবে না। সীমানার মধ্যে প্রতিপক্ষকে স্পর্শ করলে প্রতিপক্ষ মৃতবলে গন্য হবেন।

ঘ. অন্যন্যাদের মত দলনেতা (কুমীর) এরও একটি নির্দিষ্ট গআঙের দায়িত্ব থাকবে। এ ছাড়াও অন্যান্য গআঙের মাঝরেখা বরাবর সামনে পিছনে চলাচল করতে পারবে এবং মাঝরেখাতে পায়ের পাতা রেখে রেখা অতিক্রমকালে উচানী দলের খেলোয়ার দের স্পর্শ করতে পারবে। তবে উচানী দলের কোন খেলোয়ার রীতিমত সব গআঙ পার হয়ে ফেরার পথে শেষ সীমারেখা অতিক্রম করার পরও সীমানায় এক পা রেখে নাগাল পেলে সীমানার বাইরেও তাকে স্পর্শ করতে পারবে।

ঙ. খেলা চলার সময় উচানী দলের দলনেতা বহিস্কৃত হলে তার দল পরাজিত বলে বিবেচিত হবে এবং পরবর্তী গেইম নির্ধারিত থাকলে তাতে তারা পেদানী দলের অবস্থান যাবে।

চ. উচানী দলের কোন খেলোযার যদি পেদানী দলের কারোর স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সব গআঙ পার হয়ে ফিরে আসতে পারে তবে তারা খেলায় বিজয়ী বলে গণ্য হবে।

ছ. খেলা চলতে থাকলে বিজয়ী দলই আবার উচানী দল হিসাবে খেলবে।

৯. গাত / গাত্তয়া খেলা

এটি কোন দলীয় খেলা নই একক খেলা। এই খেলা শুধুমাত্র দুই জনের মধ্যে খেলা হয়, তবে দর্শক হিসেবে থাকেন অনেকজন। এটি খেলার সময় প্রত্যেক জনের সামনে পাঁচ বা সাতটি গর্ত থাকে এবং প্রত্যেক গর্তে ৫/৭টি গুটি থাকে। এই গুটিগুলি সাধারণত সাইজ করা গোলাকার পাথরের টুকরো হয়। খেলার সাথে গর্তের একটা সর্ম্পক আছে বলে একে গাত্তয়া বা গর্ত খেলা বলা হয়। এখানে গাত্তয়া বা গাত অর্থ গর্ত। এই খেলা সাধারণত ছোট ছোট বাচ্চারা খেলে থাকে, বড়দের খেলা এটি নই। এটি খেলার নিয়ম হচ্ছে- প্রতিটি খালি গর্তে উভয় পাশে ৫/৭টি গুটি দিয়ে পরিপূর্ণ করে রাখতে হবে। তারপর নির্দিষ্ট একটি গর্ত থেকে সবগুটি নিয়ে পরবর্তী প্রতিটি গর্তে একটি করে রেখে দিতে হবে। যেখানে শেষ হবে তার পরবর্তী থেকে আবার একই নিয়মে গুটি নিয়ে শুরু করতে হবে পরবর্তী খেলা। এভাবে নির্দিষ্ট গুটি শেষ হওয়ার পর যতক্ষণ না খালি গর্ত পাওয়া না যাবে ততক্ষণ এভাবে খেলতে হবে। খালি গর্ত আসলে বুঝতে হবে খালি ঘরের পরবর্তী গর্তের প্রতিটি গুটি

নিজের। এরপর গুটি নেওয়ার পর আবার শুরু করতে হবে আগের মতো করে। তবে একসাথে পাশাপাশি যদি দুটি খালি গর্ত থাকে তাহলে বুঝতে হবে, খেলার মাঠ এখন প্রতিপক্ষের হাতে। এভাবে খেলতে গিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত গর্ততে গুটি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত খেলা চলমান থাকবে। খেলা শেষ হওয়ার পর উভয়ের গুটি গণনা করে যে বেশী গুটি পাবে সেই বিজয়ী হবে।

১০. ঢাঙ / ঢাঙগুলি খেলা

ঢাঙগুলি খেলা তন্‌চংগ্যারা ছাড়াও অন্যরা খেলে থাকে এই খেলা। এই খেলা মজার হলেও আছে যথেষ্ট ঝুকি। এই খেলা একক বা দলগত না হয়ে সাধারণত পুরো একটি গ্রুপে অনুষ্ঠিত হয়। যিনি মারবেন তিনি ছাড়া তখন অন্যরা সবাই তার বিপক্ষ দলের বলে বিবেচিত হন। এই খেলা খেলার জন্য একটি খোলা মাঠ দরকার, সাথে দরকার চিকন বা ছোট দুই টুকরো গাছ। এই দুই টুকরো গাছের মধ্যে একটি লম্বা আর অন্যটি তার তিন ভাগের একভাগ। ছোট গাছের দুই মাথায় উল্টো পিঠে চ্যাপ্টা রাখা করা হয়। মূলতঃ এই ছোট একটি মাথায় চ্যাপ্টা থাকার কারণে খেলাটি নাম ঢাঙগুলি। চ্যাপ্টা রাখার অন্যতম কারণ হচ্ছে ঢাঙগুলিটি ছুঁড়ে মারার পর একটি পিঠের যেকোন একটি সাইড বা পাশে যেন আলগা থাকে। আর এই আলগা থাকা অর্থ ঢাঙগুলিটি মারার ক্ষেত্রে যেন সহজ করে হয়। যখন যে ঢাঙগুলি মারবে আর অন্যজনরা সবাই তার প্রতিপক্ষ। একজন যখন ঢাঙগুলিটি লম্বা গাছের টুকরোর সাহায্যে সামনে দিকে ছুড়ে মারার প্রস্তুতি নিবে বা মারবে তখন অন্যরা সবাই তা ধরার জন্য প্রস্তুত থাকবে। ধরতে পারলে যিনি ঢাঙগুলিটি ছুড়ে মারছেন তিনি মারা যাবেন আর মারা গেলে তিনিও তখন ঢাঙগুলিটি ধরার দলের সদস্য হয়ে যাবেন। একজন আউট হয়ে যাওয়ার পর আরো একজন আসবে। তার আগে অবশ্যই ১,২,৩ করে লটারী করে সিরিয়াল করে নেওয়া হয়। আর ধরতে না পারলে সামনে পাতানো একটি গর্তের উপর পাতা লম্বা লাঠিটি লক্ষ্যবস্তু করে ছুড়ে মারতে হবে, ছুড়ে মারার পর যদি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় তাহলে সে মারা যাবে আর না পারলে সে তার লম্বা লাঠি দিয়ে ঢাঙগুলিটি আঘাত করে ক্রিকেট বলের মতো মেরে অনেক যতদুর নেওয়া যায় নিতে চেষ্টা করবে। একবার মেরে যতদুর নেওয়া যায় ওখান থেকে গর্ত পর্যন্ত সে লাঠি দিয়ে মেপে মেপে গর্ত পর্যন্ত নেওয়া হয়। এই মাপার ক্ষেত্রে এক লাঠি মানে এক পয়েন্ট। এভাবে যে যত বেশী লাঠির দুরত্ব অর্জন করবে সে তত বেশী পয়েন্ট এর মালিক হবে। যে যত বেশী দুরে নিতে পারবে সে তত জয়ের দিকে এগিয়ে যাবে। এই খেলা সাধারণত ছোট ছোট বাচ্চারা খেলে।

১১. শামুক খেলা

শামুক খেলা তন্‌চংগ্যা সমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়। এই খেলা সাধারণত ছোট ছোট বাচ্চারা খেলে থাকে আবার অনেক সময় বলা এটি বিশেষ করে মেয়েদের খেলা। শামুক খেলার প্রধানতম উপাদান হচ্ছে ছোট ছোট কিছু শুকনো শামুকের খোলস, তন্‌চংগ্যারা একে 'শামু-গ ছোয়ালাক' বলে সমম্বোধন করে। এই শামুকের খোলস আবার আদিবাসীরা

আগুনে পুড়ে পান খাওয়ার চুনা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। শামুক খেলা খেলার জন্য দুইজন বা কয়েকজন মিলে একসাথে খেলা যায়। খেলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ধারাবাহিক রক্ষা (একজনের পর একজন)করতে হয়। শামুক খেলা খেলার সময় যার প্রথমবার খেলা শুরু করার সুযোগ হবে, সে প্রথমে সবগুলি শামুক মাটিতে ছিটিয়ে দিবে। শামুকগুলি তিনি এমনভাবে মাটিতে ছিটিয়ে বা ছেড়ে দেবেন যেন শামুকগুলি প্রত্যেকটি থেকে নির্দিষ্ট একটা দুরত্বে ছড়িয়ে পড়ে, এরপর নির্দিষ্ট দুরত্বের মাঝখানে খালি বা ফাঁকা জায়গায় আঙ্গুল দিয়ে একটা দাগ টেনে একটা শামুককে টেনে দুই শামুককে আঘাত করা হয়। আঘাত যদি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় তাহলে সেখান থেকে একটি শামুক নিজের। তবে একটি শামুককে অন্য একটি শামুককে আঘাত করার সময় এমনভাবে আঘাত করতে হবে যেন একসাথে একের অধিক শামুককে আঘাত না করে। একের অধিক শামুককে আঘাত করলে এবং নির্দিষ্ট শামুককে আঘাত করতে না পারলে বুঝতে হবে নিজের পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। এরপর অন্যজনের হাতে চলে যাবে নিজের নিয়ন্ত্রণ। এভাবে একজনের পরপর খেলা নিয়ন্ত্রন হাত বদল হয় যতজন খেলবে তাদের মধ্যে। এইভাবে যতক্ষণ না একজন বাদে অন্যরা সবাই আউট হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত খেলা স্থায়ী থাকবে। যখন সমস্ত শামুক একজনের হাতে চলে যাবে তখন খেলা আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হবে এবং তিনি তখন বিজয়ী হবেন।

১২. দো-দো বা কাবাডি খেলা

দো-দো খেলা হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কাবাডি। তন্‌চংগ্যা একে দো-দো খেলা বলে। এই খেলা বাংলাদেশে সব জায়গায় বেশ জনপ্রিয়। এই খেলাটি সাধারণত দুটি দলে বিভক্ত হয়ে অনুষ্ঠিত হয়। একটি দলে ৪/৫ জনের মতো খেলোয়াড় থাকে তবে অনেক সময় এর বেশীও নেওয়া হয়। তবে এটি নির্ভর করে সময়, উপস্থিত দর্শকের খেলার আগ্রহ এর উপর। এই খেলাটি খেলার জন্য দরকার উম্মুক্ত এবং বড় একটি মাঠ। তাছাড়া খেলা শুরুর আগে খেলা জন্য নির্ধারিত জায়গার মাঝখানে একটি সোজা দাগ টানতে হয় বা দিতে হয়। ঐ দাগটিকে বলা বিজয়ী বা মরণ রেখা বা দাগ। কারণ এটি স্পষ্ট করার উপর নির্ভর একটি দলের বা খেলোয়াড়ের বিজয় এবং পরাজয়। খেলা শুরুর আগে দুই দল তাদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় বা পয়েন্টে গিয়ে অবস্থান করবে। এই খেলার মধ্যে সবার থেকে একজনকে দলনেতা নির্বাচন করা হবে, মূলতঃ তিনিই পুরো দলকে নিয়ন্ত্রন করবেন এবং কার পরে কে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল বা মারার জন্য প্রতিপক্ষের কোর্টে হাজির হবেন। আর থাকবে একজন রেফারী। এই রেফারীই পুরো খেলা পরিচালনা করবেন। তবে অনেক সময় রেফারী থাকেন না। এটি নির্ভর করে উভয় দলের খেলোয়াড়দের বুঝা-পারার উপর। খেলা শুরু হলে যেকোন একটি দল থেকে একজন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের দলের দিকে নির্ধারিত চিহ্ন বা দাগ অতিক্রম করে দু-দু শব্দ করে এগিয়ে যাবেন। এই 'দো-দো' শব্দটি দীর্ঘ হবে 'এক নিঃশ্বাস', এক নিঃশ্বাস শেষ হওয়ার পর কখনো দ্বিতীয় বারের মতো দো-দো শব্দ করে নিঃশ্বাস নেওয়া যাবে না আর যদি নেওয়া

হয় তাহলে প্রতিপক্ষ যদি তাকে স্পর্শ করে তাহলে সে মৃত বা পরাজিত বলে গন্য হবে। নিঃশ্বাস নেওয়া অর্থ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করা। অনেক সময় এক বারই সবাই মরে যায় আর সেটি হচ্ছে সবাই যখন তাকে ধরে আটকাতে যায় ঠিক সেসময় সে যখন দাগটি স্পর্শ করে এক নিঃশ্বাসে তখন সবাই মৃত বলে ঘোষিত হয়। এভাবে উভয় দল থেকে একজনের পর একজন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষকে আক্রমন করার জন্য যাবে এবং প্রস্তুত থাকবে। আর এই এক নিঃশ্বাসের মধ্যে যদি সে কাউকে স্পর্শ করে তার নিজ দলে বা কোর্টে ফিরে আসতে পারে, তাহলে সে যতজনকে স্পর্শ করেছে ততজন মৃত বা পরাজয় বরণ করেছে বলে ধরে নেওয়া হবে। আর তখন তারা মাঠের বাইরে বা খেলার কোর্টের বাইরে অবস্থান করবে। এরপর উক্ত দল থেকে যদি আরো একবার প্রতিপক্ষের দলে গিয়ে কাউকে মেরে বা স্পর্শ করে আসতে পারে তাহলে যতজনকে করবে ততজন তার দল থেকে জীবিত হবে বলে বিবেচিত হবে। এভাবে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় একই নিয়মে তার প্রতিপক্ষের কোর্টে উক্ত শব্দ করে খেলোয়াড়দেরকে স্পষ্ট বা আঘাত করতে যাবে। এইরকম করতে করতে একটি দলের আর যদি কেউ জীবিত না থাকেন বা খেলার মতো না থাকেন তাহলে যাদের দলে জীবিত খেলোয়াড় থাকবে তারা বিজয়ী বলে ঘোষিত হবে। এই খেলাটি ছেলে-মেয়ে উভয়ে খেলে থাকে। ছেলেদের মধ্যে গাবুর-গাবুর, গাবুরে-মাঙগোইন, মাঙগোইন - মাঙগোইন অনুষ্ঠিত হয়। আর মেয়েদের মধ্যে যুবতী-যুবতী, যুবতী- মাঙগোইন বা মাঙগোইন - মাঙগোইন এর মধ্যে হয়ে থাকে। এই খেলা খেলার সময় দু-দু শব্দ করা ছাড়াও তন্চংগ্যারা 'আম পাদা লক্ষণ তরে মাইত্তে কদকক্ষণ' এবং বেল 'বেল কাঠতল পাদা বেল, মে ন পাইনে তা সিদি গেল' শব্দগুলি করে থাকে। আর এই খেলা সাধারণ বিকেল বেলা খেলা হয়ে থাকে।

নোট ঃ মাঙগোইন অর্থ- যারা বিয়ে করেছে এবং ২/১ সন্তানের বাবা বা মা হয়েছে।

১৩. কাইন্ বা কঞ্চি খেলা

তঞ্চঙ্গ্যা বাশেঁর কঞ্চি অর্থ হচ্ছে কাইন্। 'কাইন্ খেলা' হচ্ছে ছোট ছোট বাচ্চাদের খেলা, অনেক সময় এটি মেয়েলি বা মেয়েদের খেলাও বলা হয়। এটি সাধারণত দুই জনের মধ্যে খেলা হয় আবার অনেক সময় অনেকজন মিলেও খেলা হয়, তবে কোন দল থাকে না। এটি খেলার জন্য প্রধানতম উপাদান হচ্ছে বাশেঁর কঞ্চি বা কাইন্। তবে এই বাশেঁর কঞ্চিগুলি দীর্ঘ ৩/৪ ইঞ্চির বেশী হবে না। আর সাইজ হবে একটি শন এর গোড়ার অংশের মতো মোটা বা পুরু। যাকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বলা হয় 'শ-ন দাধি ফা'। বাংলায় যাকে বলা হয় একটি শনের গোড়ার মতো। এই খেলা খেলার সময় সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সচেতনতা। তবে সব খেলারিই সচেতনতা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই খেলাগুলি খেলার সময় উভয়ের কাছে নির্দিষ্ট সমপরিমাণ বাশেঁর কঞ্চি থাকবে। প্রত্যেকের কাছে একটাও কম বা বেশী থাকবে না। তারপর নির্দিষ্ট একজন সমস্ত কঞ্চিগুলি নিয়ে সামনে নির্দিষ্ট স্থানে ছেড়ে দিবে,তারপর ওখান থেকে একটা একটা করে তুলে নিবে। তুলে নেবার সময় অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যাতে একটা কঞ্চি নেওয়ার দ্বিতীয় বা

তৃতীয় কোন কাইন্ বা কঞ্চি নড়ে না উঠে বা স্পর্শ না করে। যদি নড়ে উঠে বা স্পর্শ করে তাহলে তার খেলা সে সময়ের জন্য বন্ধ হবে এবং তখন খেলাটি প্রতিপক্ষের হাতে চলে যাবে। এভাবে খেলতে খেলতে যে বেশী কঞ্চির মালিক হবে বা অন্যজন একেবারে কঞ্চি শূণ্য হবে তখন খেলা সমাপ্ত হবে। এইভাবে সমস্ত কঞ্চি যার আয়ত্বে থাকবে উক্ত খেলায় সে বিজয়ী বলে বিবেচিত বা ঘোষিত হবে।

১৪. লুআ লু-ই বা লুকোচুরি খেলা

লুকোচুরি বা চোর চোর খেলাই হচ্ছে তন্‌চংগ্যা ভাষায় 'লুআ লু-ই খেলা'। এই খেলা সাধারণত ছোট ছোট বাচ্চারা খেলে থাকে আর খেলা হয় ঘরের ভিতর এবং ঘরের বাইরে দুই জায়গায়। তবে ঘরের ভিতর না খেলার জন্য মুরুব্বীরা নিষেধ করেন। এই খেলা খেলার সময় যিনি চোর (অন্যদের যিনি খুজে বেড়ান) হবেন তিনি অন্যজনদেরকে খুজে বের করবেন। এই চোর চোর বা লুকোচুরি খেলা খেলার সময় একটি নির্দিষ্ট জায়গাকে কেন্দ্র ধরে, ঐ কেন্দ্র থেকে সব কিছু নিয়ন্ত্রন করা হয়। যিনি চোর হবেন তিনি সব সময় ঐ কেন্দ্র বা জায়গাকে চোখে চোখে রেখে অন্যদের খুজে বেড়ান। তার ভুলে বা অজান্তে কেউ যদি ঐ কেন্দ্রে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় পা রাখতেন বা দখল নেন তাহলে যিনি আগে থেকে চোর আছেন তিনি পুনরায় চোর হিসেবে রয়ে যাবেন। খেলাটি যদি তার অনুকুলে সুষ্ঠভাবে সম্পূর্ণ হয় তাহলে তিনি প্রথম যাকে খুজে পাবেন তিনিই পরবর্তী রাউন্ডে চোর বলে বিবেচিত হবেন। তবে এই লুকোচুরি খেলা নিয়ে তন্‌চংগ্যা সমাজে একটা লোক-বিশ্বাস লালন করেন। আর সেটি হচ্ছে বাড়িতে লুকোচুরি খেলা খেলার সময় কেউ যদি বাড়ির অন্ধকার প্রকোষ্টে বা কোনায় লুকিয়ে থাকে, পরবর্তীতে তাকে আর খুজে পাওয়া যায় না। তন্‌চংগ্যা সমাজে বিশ্বাস আছে ভূত তাকে তার 'অন্ধকোষে' অদৃশ্য করে লুকিয়ে রাখে। তাই তন্‌চংগ্যা সমাজে নিষেধ আছে বাড়ির ভিতর লুকোচুরি খেলা না খেলার জন্য। কারণ এতে অপ্রত্যাশিত বিপদ আসতে পারে।

১৫. ইচিবিচি খেলা

এই খেলাটি সাধারণত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা খেলে থাকে। আবার অনেক সময় কিশোররাও অতি উৎসাহে এটি খেলে থাকে। খেলাটি কোন দলীয় বা একক না হয়ে সমন্বয়ভাবে হয়ে থাকে। এই খেলাটি খেলার জন্য প্রধানতম উপকরণ হচ্ছে হাত। যারা এই খেলায় অংশ গ্রহন করবে তারা প্রত্যেকে তাদের দুটি হাত মাটিতে উপর করে রাখবে। তারপর একজন- 'ইচি বিচি খর্মা বিচি, ইত চলে মুইত্ চলে, গাবুর মাইনচ্ ঠেঅত্ তলে, রাজা বাবু কুয়েদে শিউলি আত্তান্ খাবি নিবারলুই' এই বাক্যটি বলে খেলা শুরু এবং সম্পূর্ণ করবে। এভাবে যতজন খেলবে ততজন তাদের দুটি হাত মাটিতে উপর করে রাখবে। তারপর একজন উক্ত মন্ত্রটি বলে খেলা শুরু করবে। খেলাটি শুরু হবে নির্দিষ্ট একটি হাত থেকে উক্ত বাক্যটি বলে। শেষ শব্দে এসে মানে 'নিবারলুই' যেখানে বলা হবে সে আঙ্গুলটি বাকাঁ বা ভেঙ্গে মাটিতে পুতে রাখবেন। এভাবে খেলতে খেলতে শেষ পর্যন্ত যার একটি আঙ্গুল থাকবে মানে কাটা পড়বে না তিনি বিজয়ী বলে বিবেচিত হবেন। আর যার সবগুলি আঙ্গুল কাটা পড়বে তিনি পরাজিত হয়েছেন বলে বিবেচিত হবেন।

১৬. কুত্তা খেলা

এটি পাচঁটি গুটির খেলা। এই গুটিগুলি সাধারণত পাথরের হয়ে থাকে। এই খেলায় ছয়টি পর্ব আছে। প্রথম পর্বকে বলে- একা, দ্বিতীয় পর্বকে বলে- দিআ, তেমনি তিতিয়া, চা-ড়া, পা-চা আর খাবাই দিআনি। এই খেলা সাধারণত ২ বা তার অধিক খেলোয়াড় মিলে খেলা হয়। এই খেলাটি অনেক সময় দলীয় খেলা হয়। খেলাটি প্রথমে একজন 'একা' থেকে তার খেলা শুরু করবে। 'একা' অর্থ হচ্ছে- সে এক সাথে পাঁচটি গুটি মাটিতে ছেড়ে দিবে এবং ছেড়ে দেওয়ার সময় এমনভাবে দিবে যেন গুটি নির্দিষ্ট ফাঁকা ফাঁকা করে পড়েন আর এটি নিজের সুবিধার জন্য। তারপর সে একটি গুটি নিয়ে উপর দিকে ছেড়ে দিবে তারপর উপড়ে ছুড়া গুটিটি মাটিতে পড়ার আগে হাতে ধরে নিচে থেকে একটি গুটি নিয়ে দুটিই গুটি মুঠো বন্দি করতে হবে। এভাবে সে উপরে একটি গুটি ছুড়ে দিয়ে নিচে থেকে দুটি, তিনটি এবং চারটি গুটি তুলে নিয়ে দি-আ, তি-না/তিতিয়া, চা-ড়া পর্ব মারা সম্পূর্ণ করবে। এর মধ্যে একটি পর্বতে সে যদি ব্যর্থ হয় তাহলে গুটি মারার প্রতপক্ষের হাতে চলে যাবে। প্রতিপক্ষ যদি এভাবে মারতে গিয়ে যেকোন একটি ব্যর্থ হয় তাহলে তার পরের জনের হাতে চলে যাবে। খেলোয়াড় যতজন হোক না কেন, পরবর্তীতে যদি আবার মারার সুযোগ আসে তাহলে যে পর্বতে ব্যর্থ হয়েছেন ঠিক সে পর্ব থেকে আবার শুরু করতে হবে। ঠিক এভাবে সফলতা এবং ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে হাত বদলের মাধ্যমে এই কুত্তা খেলা এগিয়ে যায়। এভাবে 'একা, দিআ, তিনা/তিতিয়া, চা-ড়া' পর্ব শেষ করার পর পা-চা পর্বতে যেতে হয়। 'পা-চা' হচ্ছে একসাথে সব গুটি মাটিতে ছেড়ে দিয়ে নিজের সুবিধা গুটিগুলির সামনে বাম হাতের যেকোন দুটি আঙুল দিয়ে একটা ফাঁদ বা দরজা তৈরী করে নিতে হবে। তারপর একটি গুটি উপর দিকে তুলে উক্ত গুটিটি মাটিতে না পড়ার আগে ধরে মাটিতে ছেড়ে দেওয়া গুটি থেকে একটি একটি বা একসাথে দুটি বা সবগুলি সে দরজা বের করে দিতে হবে। একটি একটি ঢুকালে প্রথমবার ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে ২/৩ বার সুযোগ পাওয়া যায় কিন্তু একসাথে ঢুকাতে গেলে মাত্র একবার সুযোগ পাওয়া যাবে। সর্বশেষ পর্ব হচ্ছে 'গেম খাবাই দিআনি' পর্ব। এই পর্বে হাতের পাতায় পাঁচটি গুটি একত্রে রেখে একটু উপরে তুলে উল্টো পিঠে তুলে নিতে হবে। তারপর আবার শূন্যে ভাসিয়ে যতটা গুটি পাওয়া যায় ততটা পয়েন্ট হিসেবে গন্য হবে। এভাবে কোন খেলোয়াড় যদি সেইভাবে ১০/১৫ পয়েন্ট লাভ করে তার মানে প্রতিপক্ষ ততটা গেম খেয়েছে বলে গন্য হবে। তারপর অপর প্রতিপক্ষ যদি 'গেম খাবাই দিআনি' পর্ব এর মাধ্যমে ৫/১০ টি গুটি ধরতে পারে তাহলে প্রতিপক্ষের ১০/১৫ টি পয়েন্ট থেকে ৫/১০ টি পয়েন্ট শোধ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। আর তখন পয়েন্ট শোধ করার বাকী থাকবে ৫ টি। এভাবে কুত্তা খেলা নানা পয়েন্ট অর্জন এর মাধ্যমে জয়-পরাজয়ের মধ্যে এগিয়ে যায় এবং পরিসমাপ্তি হয়।

১৭. জোড়-বিজোড় খেলা

এটি একটি মজার খেলা, সাথে বুদ্ধির খেলাও। এই খেলাটি সাধারণত ছোট ছোট বাচ্চারা খেলে থাকে আর এটি কোন দলীয় খেলা নই 'সমন্বয়ী' খেলা। এখানে সবাই সবার

প্রতিপক্ষ। যারা এই খেলায় অংশ গ্রহন করবে তাদের থেকে যেকোন একজনকে ঠিক করা হবে যে খেলা শুরু করবে। তারপর যিনি শুরু করবেন তিনি একটি হাত মুটিকাবদ্ধ (বন্ধ) করে কিছু একটা ছোট জিনিস (মার্বেল, পয়সা বা অন্য কিছু) লুকিয়ে রাখবে। তারপর বলবে এখন বলতো, এখানে যে জিনিসগুলি আছে সেগুলি জোড় না বিজোড়। তখন যেকোন একজন বা অন্যজন বা একসাথে সবাই জোড় বা বিজোড় বলে উঠবে। তখন যিনি হাত মুটিকাবদ্ধ করে রেখেছেন তিনি বলবেন সবাই না একজন-একজন করে বলবে। তখন যারটা সঠিক হবে সে পয়েন্ট পাবে এবং পয়েন্ট এর দিক থেকে সে অন্যদের থেকে এগিয়ে যাবে। অনেক সময় দুষ্টমির ছলে অনেকে জোর করে মুটিকা খুলার চেষ্টা করবে। এই খেলার নির্দিষ্ট কোন সময় নির্ধারণ করা থাকে না। তাই খেলার সময়টা নির্ভর করে খেলোয়াড়দের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর। খেলার সময় সবার কাছে সমান সংখ্যক গুটি থাকবে। খেলতে গিয়ে যে গুটিকা শূণ্য হবে সে আউট(উক্ত পর্বের জন্য অযোগ্য) বলে গন্য হবে। এভাবে খেলতে গিয়ে একজন বাদে বাকী সবাই যখন গুটিকা শূণ্য হবে তখন খেলা সমাপ্ত হবে এবং যার কাছে সবার গুটি থাকবে সে বিজয়ী হিসেবে গন্য হবেন। অসেক সময় খেলা চলাকালীন বা শেষে বিজয়ী বা যার বেশী গুটি আছে তার থেকে গুটি ধার নেওয়া যায়। তবে সেটি সব সময় হয়ে উঠে না।

১৮. তেদুই বিচি খেলা

এটি মূলতঃ তেতুল বীজ দিয়ে খেলা। এই খেলাটি সাধারণত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা খেলে থাকে, গাছের ছায়ায় বাড়ির উঠানের কোন একটি কোণে। এটি একক কোন খেলা নই, এই খেলায় সবাই সবার প্রতিদন্ধী। এই খেলা খেলার জন্য প্রধান উপকরণ হচ্ছে তেতুল বিচি এবং ১ ফুট দীর্ঘ এক টুকরো বাশেঁর কঞ্চি। এই দলে সবার থেকে কম-বেশী তেতুল বিচি থাকে। তারা সবাই মিলে ঠিক করবে কতটা করে তেতুল বিচি রাখবে বাঁশের কঞ্চির মধ্যে, তারা সবাই তেতুল বিচি থেকে নির্দিষ্ট একটি দুরুত্বে দাঁড়াবে। তারপর সে দুরুত্ব থেকে তেতুল বিচিগুলির দিকে লক্ষ্য করে একটি তেতুল বিচি নিক্ষেপ করবে। নিক্ষেপ করা তেতুল বিচির আঘাতে যতগুলি তেতুল বিচি বাঁশের কঞ্চি থেকে মাটিতে পড়বে ততটা তেতুল বিচির মালিক সে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সবাই মারা পর শেষ পর্যন্ত যারা যে বেশী বিচির মালিক হবে সে জয়ী বলে বিবেচিত হবে।

উপসংহার : তন্চংগ্যারা উলেখিত খেলাগুলি ছাড়াও আরো অনেক খেলাধুলা খেলে থাকে যেগুলি তাদের মধ্যে যেমন জনপ্রিয় তেমনি জনপ্রিয় অন্যজনদের কাছেও। আবার একই খেলা সমান জনপ্রিয় সমতলের বাসিন্দাদের কাছেও। যেমন : ফুটবল খেলা, দাবা, ছক্কা খেলা, দঁাড়ি টানা-টানি, ম্যাজিক বল, ক্রিকেট , ভলি বল, ক্যারাম, টেনিস, টেবিল টেনিস, মোরগ লড়াই, সাতাঁর, দৌড়ঁ প্রতিযোগিতা, ব্যাডমিন্টনসহ ইত্যাদি। তবে উপরে যেসব খেলার কথা বলা হয়েছে, সেসব বেশীর ভাগ খেলা আদিবাসীদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি প্রত্যেকভাবে ধারণ করে এবং ফুটে উঠে, বিশেষ করে ঘিলা খেলা আর নাদেং খেলা তন্চংগ্যা আদিবাসীদের জীবন এবং সংস্কৃতির সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। এইসব খেলাধুলার মাধ্যমে তারা জীবনের বিনোদনটুকু খুজে পাওয়ার চেষ্টা কওে, নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ভালোবাসাকে সাথে করে। তারা চাই এই ঐতিহ্যবাহী খেলাকে বাচিঁয়ে এবং টিকিয়ে রাখতে। তার জন্য তারা সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

লেখক : সাবেক ছাত্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

শোকেস্ বন্দি খিয়াং
ভাষা ও সংস্কৃতি

পাইথুইঅং খিয়াং (প্রধান শিক্ষক)

একটি জাতির প্রকৃত পরিচয় বহন করে, সে জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে। যে জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি যত সমৃদ্ধ সে জাতি তত উন্নত।একটি জাতির পরিচিতি যদি আমরা তুলে ধরি তাহলে সে জাতির মাতৃভাষা পোষাক পরিচ্ছদ, ধর্মীয় বিশ্বাস, খাদ্যভ্যাস, লোকবিশ্বাস, স্ব স্ব বর্ণমালা, গল্প, কবিতা, ছড়া, খেলা ধূলা বর্ণিত সব বিষয় নিয়েই তার সংস্কৃতি। বর্তমানে সব কিছু বিলুপ্ত, নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করা হয় না বললেই চলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, খুমি, মুরং, লুসাই, পাংখোয়া, খিয়াং, আদিবাসি জনগোষ্ঠী। খিয়াং জাতির আনুমানিক জনসংখ্যা ৪০০০ হাজার থেকে ৪৫০০ হাজারের মধ্যে। খিয়াংদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। খিয়াং আদিবাসি জনগোষ্ঠীর তাদের থামি কাপড় (লুঙ্গি), জামা পরিহিত অবস্থায় দেখলে অথবা তাদের নাম শুনলে তারা কোন জনগোষ্ঠী তার পরিচিতি পাওয়া যাই। বর্তমানে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির আগ্রাসনে বিলুপ্ত। বর্তমানে সে সমস্ত জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন মেলা, বৈ-সা-বি উৎসবের সময় তাদেরকে নিজস্ব পোষাকে পরিহিত অবস্থায় দেখা যাই। তখন বন্দি শোকেস থেকে নিজেদের ব্যবহৃত কাপড় অলংকার বের করে পরিধান করে। বিভিন্ন মেলাতে আদিবাসিদের ব্যবহৃত জিনিষপত্র প্রদর্শনীর জন্য দোকান দেওয়া হয়। বর্তমানে অনেকে নিজেদের ব্যবহার্য জিনিষপত্র মূলধন হিসাবে চিন্তা করে পুঁজিবিনিয়োগ করছে, এক দিকে মাতৃভাষা বিলুপ্ত হচ্ছে, অন্যদিকে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে অনেককেই নিজ মাতৃভাষা থেকে সরে ও যেতে হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু খিয়াং আদিবাসী মাতৃভাষা তাদের মুখ থেকে চলে যাচ্ছে ইতিহাসের পাতায় জাদুঘরে। শিক্ষিত মা-বাবা ও তাদের ছেলে- মেয়েরা খিয়াং ভাষা ব্যবহার করছে না তাছাড়া খিয়াং ভাষা শেখার সুযোগ ও পরিবেশ পায় না। শেখার প্রয়োজন ও মনে করে না।

শিশু বয়স যখন ১-৫ বৎসর তখন মায়ের স্নেহ আদর-যত্নের মাধ্যমে নিজস্ব মাতৃভাষা শেখার উপযুক্ত সময়। তখন অনেক দুর্গম এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠি ছেলে মেয়েদের সু-শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে পিতামাতা কোমলমতি শিশুদের দেশের বিভিন্ন বোডিং স্কুলে ভর্তি করান। তখন থেকে কোমলমতি শিশুদেরকে ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং নিজের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়, এমন কি মা-বাবার দেওয়া নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করা হয়। তখন হারিয়ে যাই শিশুটির মাতৃভাষা, মৃত্যু হয় একটি ভাষা। পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাই একটি জাতি এবং তার ভাষা। শিক্ষা জীবন শেষ করে যখন নিজ বাড়ীতে আসেন তখন দেখা যায় পরিবারের সঙ্গে মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত জন্মদাতা পিতা মাতার সঙ্গে বাংলা অথবা যে কোন ভাষার মাধ্যমে পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়।

তাহলে ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষা করার স্বপ্ন যদি আমার মাতৃভাষার বিসর্জন দিতে হয়, তাহলে সে শিক্ষা কখনো সুশিক্ষা হতে পারে না। যতি তাই হয়। তাহলে তারা কোন জাতির ভাষা সংস্কৃতির পরিচয় দেব এবং জাতি হিসাবে আমরা কি নিয়ে গর্ব করব। গর্ববোধ করবো তখনি যখন যে জাতির ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবো এবং অনর্গল ভাবে কথা বলতে পারবো। শুধু সভা, সেমিনার, র‍্যালী ও মানব বন্ধন করে একটা জাতির ভাষা এবং সংস্কৃতি রক্ষা করা যাবে না। তার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন জাতীয়তা বোধ। প্রত্যেক জাতির যার যার সংস্কৃতি লালন করতে হবে এবং হৃদয়ে ও আত্মাতে ধারণ করতে হবে। শিক্ষিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আমরা নিজস্ব মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে শিক্ষিত হতে হবে।

বর্তমানে খিয়াং জাতির মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা নিজেদের কে অনেক সুশিক্ষিত সভ্য খিয়াং জাতি মনে করেন। তারা যে খিয়াং ভাষায় কথা বলেন সে ভাষা নিরক্ষর খিয়াংদের বুঝতে অসুবিধা হয়। কারণ শিক্ষিত খিয়াং রা যে, খিয়াং ভাষায় কথা বলেন সে ভাষায় বাংলা ইংরেজী সংমিশ্রনে আলাদা ভাষা কোনটিই প্রকৃত খিয়াং ভাষার মধ্যে পরে না।

একটা জাতির পরিচয় দিয়ে যদি সে জাতির ভাষায় কথা বলতে না পারেন, অথবা মনের ভাব প্রকাশ করতে না পারেন ইহার জন্য লজ্জা ও অপমানিত হওয়া ছাড়া এই পৃথিবীতে স্থান নেই। অনেক সময় দেখা যায় নিজেকে খিয়াং জাতি পরিচয় দিয়ে সরকারের অনেক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেন। যে খিয়াংরা নিজেদেরকে অনেক শিক্ষিত মনে করে তাদের সকলের শিকড় গ্রামে। তাদের ছেলে মেয়েদের বৎসরে দু-এক বার নিজ গ্রামের সঙ্গে পরিচিতি করাবে এবং নিজ জাতির লোকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করাবে সেটি প্রত্যেক মা বাবা পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। এভাবে করলে ছেলে মেয়েদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। দেশ, মাটি ও মাতৃভাষা সম্পর্কে ধারণা জন্মায়।

স্বীকার করি, একটা জাতিতে শিক্ষিতের হার কম বা নাই তার জন্য সে জাতির প্রতি আপনার ভালবাসা, সম্প্রীতি, মায়া মমতা ও সহানুভূতি আছে তাই বলে সে জাতি হিসাবে নিজেকে পরিচয় দেওয়া সু শিক্ষিতের সভ্য কাজ নয়। ইহা স্বার্থবাদী ছাড়া কিছু নয়। আপনি তখনি নিজকে সভ্য ও সুশিক্ষিত হিসাবে পরিচয় দিতে পারেন, যখন সে সকল জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য নিজের অর্জিত জ্ঞান ও বুদ্ধির মাধ্যমে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসবেন।

আসুন, আমরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়। সকল জাতির ভাষা, সংস্কৃতি চর্চা ও সম্মান করি। নিজস্ব মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধশালী করি এবং নিজের মাতৃভাষা সংস্কৃতি রক্ষার জন্য মনোনিবেশ করি। যদি এখন থেকে স্ব স্ব সংস্কৃতি ও ভাষা রক্ষার জন্য আমরা মনোযোগী না হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজম্মের নিকট আমরা সবাই দায়ী থাকবো। তখন একটি জাতি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটবে। আর হারিয়ে যাওয়া জাতিসমূহেকে জাতীয় জাদুঘর বা প্রদর্শনীয় জন্য সংরক্ষণ করা হবে। জাতির মাতৃভাষা হারিয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে মিশ্রবিবাহ প্রচলন। আসুন আমরা সবাই মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করি।

শ্রী লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা'র জীবন ও কর্ম

চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী আদিবাসীদের মধ্যে স্বরচিত গ্রন্থ সর্বপ্রথম প্রকাশ করেছিলেন রাজকবি শ্রী পমলাধন তঞ্চঙ্গ্যা। সেটি ১৯৩২ সালে। এরপর থেকে প্রায় প্রতি বছর দুয়েকটি গ্রন্থ চাকমা- তঞ্চঙ্গ্যাদের দ্বারা প্রকাশিত হতে থাকে। তবে চাকমা গ্রন্থকার ও নিজস্ব বা যৌথ প্রকাশনার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হলেও তঞ্চঙ্গ্যা জাতিতে এ সংখ্যা খুবই নগণ্য। রাজকবি শ্রী পমলাধন তঞ্চঙ্গ্যা থেকে শুরু করে ২০১৬ইং পর্যন্ত আমরা মাত্র নয়জন তঞ্চঙ্গ্যা গ্রন্থকারের তথ্য পাওয়া যায়। তাদের একটি তালিকা নিচে তুলে ধরা হলো-

১. রাজকবি শ্রী পমলাধন তঞ্চঙ্গ্যা (১৮৯৫- ?),
২. কবিরত্ন কার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (১৯২০-১৯৯৭),
৩. রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরো (১৯২১-২০০৮),
৪. যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (১৩৩৬ব.- ?),
৫. শ্রীমৎ ক্ষেমাঙ্কর মহাস্থবির (১৯১৮-২০০৪),
৬. শ্রী বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা (১৯৩৪-২০১৪),
৭. চিত্রশিল্পী রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা (১৯৪১-বর্তমান),
৮. শ্রী লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (১৯৫২-বর্তমান)।
৯. চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা (১৯৮৮- বর্তমান) ও

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজ, ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে এসকল গ্রন্থকারদের অবদান কম নয়। প্রথম সাতজনের অবদান সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তকে অল্পবিস্তর তুলে ধরা হলেও আমরা শেষ দুইজনের বিষয়ে কিছুই জানতে পারি না।

আজকের আলোচনায় আমরা তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নকামী একজন নীরব সাধক শ্রী লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব।

কর্মজীবন

চাকমা সার্কেলাধীন ১০০নং ওয়াগ্‌গা মৌজার দেবতাছড়ি গ্রামের মুরুংছড়া আগায় দেত্তাছড়ি মোইন পাড়া নামক স্থানে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে কবি, গল্পকার, ছড়াকার, গীতিকার লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যার জন্ম। তিনি তপস্যা তঞ্চঙ্গ্যা ও অর্মিলা তঞ্চঙ্গ্যার তৃতীয় সন্তান। লগ্নকুমারের শৈশব কাটে দেবতাছড়ি গ্রামে। ১৯৫৯ সালে তিনি স্থানীয় দেবতাছড়ি এল. পি. স্কুলে ভর্তি হন ও পরে পার্শ্ববর্তী ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কৃতিত্বের সাথে তিনি প্রতিটি ক্লাশে উত্তীর্ণ হতেন। কিন্তু পিতার আর্থিক অসংগতির কারণে বিভিন্ন সময়ে তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে থাকত। সৌভাগ্যের বিষয় যে, তখন তিনি বিভিন্ন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির আর্থিক সহযোগীতা লাভ করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী ছিলেন। দেশে মুক্তিযুদ্ধ চলায় বাংলাদেশ সরকার সেই পরীক্ষা বাতিল করে। উক্ত পরীক্ষা ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত হলে তিনি কৃতিত্বের সাথে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। মেট্রিকুলেশন পাশের পর ৯৯নং ঘাগড়া মৌজার তৎকালীন হেডম্যান ও ইউ.পি চেয়ারম্যান স্নেহ কুমার দেওয়ানের সহায়তায় তিনি হোসাইন বোল্ডার কোম্পানিতে যোগ দেন। চাকুরীরত অবস্থায় তৎকালীন আন্ডার গ্রাউন্ড সংগঠন পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি (পিবিএসপি) এর সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯৭৩ সালে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে যোগদান করেন। সংগঠনে কাজ করার সময়ে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের সুযোগ পান এবং বিভিন্ন জনের সাথে পরিচিতি ঘটে। ১৯৭৬ সালে পিবিএসপি'র বিধি অনুসারে কবিরত্ন কার্ত্তিকচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যার মেজো কন্যা সুনন্দা প্রভা তঞ্চঙ্গ্যার সাথে তাঁর পরিণয় ঘটে। এর সাত বছর পর ১৯৮৩ সালে সংগঠনের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচনে তিনি কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির পূর্ণাঙ্গ সদস্য নির্বাচিত হন এবং পার্বত্যাঞ্চলের সামগ্রীক আঞ্চলিক দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৮৪ সালে পিবিএসপি'র এক কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা সংগঠন থেকে সরে দাঁড়ালে তিনি যারপরনাই হতাশ হন। অতপর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তিনি রাজস্থলী আর্মি ক্যাম্প কমান্ডারের নিকট আত্মসমর্পন করেন এবং সংগঠন থেকে সরে দাঁড়ান। তিনি এগারো বছর পর্যন্ত এ সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৮৭ সালে তিনি বিলাইছড়ি উপজেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এর এক বছর পর দীঘলছড়ি উপজাতীয় আবাসিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও সুপারিনটেন্ডেন্ট এর দায়িত্ব লাভ করেন। সেখান থেকে তিনি ১৯৮৯ সালে রাজস্থলীর চিংখ্যং স্কুলে বদলী হন। পরবর্তী বছর রাঙ্গামাটি পি.টি.আই হতে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ কালীন পি.টি.আইতে তিনি দেয়ালিকা/৯১'এর সম্পাদক ছিলেন। পি,টি,আইতে থাকা কালীন কোনো এক সময় রাঙ্গামাটি শহরের 'রিজার্ভ মুখ সাহিত্য ক্লাব' আয়োজিত স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগীতায় 'মুই গম' নামে একটি কবিতা পাঠ করে দ্বিতীয় হন। সেই থেকে তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু হয়।

চাকুরী জীবনে তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৯০ সালে তিনি কাব লিডার বেসিক কোর্সে প্রশিক্ষণ নেন এবং ১৯৯৮ সালের নভেম্বরে 'উড ব্যাজার' সনদ প্রাপ্ত হন। তিনি শিক্ষার্থীদের স্বরচিত গান শেখাতেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেসব গান পরিবেশন করা হতো। এসব অনুষ্ঠানে তাঁর শিক্ষার্থীরা সুধীজনের ব্যাপক প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়।

কর্ম জীবনে তিনি রাজস্থলী উপজেলা স্কাউটসের সম্পাদক হিসেবে অনেক কাব হলিডে ও একটি কাব জাম্বুরীর আয়োজনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এছাড়াও তিনি গাজীপুরের মৌচাকে ষষ্ঠ বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউটস জাম্বুরীতে একটি সাব ক্যাম্পের এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর এডমিনিস্ট্রেশণ এর দায়িত্ব পালন করেন।

মেট্রিকুলেশন পাশের ২৪ বছর পর ১৯৯৬ সালে তিনি রাঙ্গামাটি মহাবিদ্যালয় হতে আই.এ পাশ করেন। এই মেট্রিকুলেশন সনদ তাঁকে ১৯৯৮ সালে প্রধান শিক্ষক পদে প্রমোশন পেতে সাহায্য করে। চাকুরীর মেয়াদ শেষ হবার দুই বছর আগে ২০১৪ সালে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির জন্য অবদান

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির কল্যাণে এই মহান পুরুষের অবদান কম নয়। ১৯৯৬-৯৭ সালে জাতি হিসেবে 'তঞ্চঙ্গ্যা' নামে বাংলাদেশ সরকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভের জন্য বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা (বাতকস) তোড়জোড় শুরু করে। বাতকসের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির একটি দল ২৩/০১/১৯৯৭ তারিখে ঢাকায় জাতীয় সংসদের চীফ হুইফ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর অফিসে উপস্থিত হয়ে স্মারক লিপি প্রদান করে। বাতকসের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে তিনিও সেই দলের একজন ছিলেন। তিনি ২০০৮ সালে গঠিত 'তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা আহবায়ক কমিটি'র একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে কমিটির ১১তম বৈঠকে তাঁকে উক্ত কমিটির সহ-সদস্য সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। (এ সম্বন্ধে আরও পড়ুন তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা কমিটি।) তিনি একজন গীতিকার, কবি, নাট্যকার, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। বিগত শতকের নববইয়ের দশক থেকে তিনি লেখালেখির সাথে জড়িত। তিনি কবিতা ও গান লিখতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এছাড়া বিভিন্ন সাময়িকীতে তাঁর রচিত অনেক কিস্‌সা, গান, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটিকা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর রচিত অনেক গান খুবই জনপ্রিয়। সেগুলোর মধ্যে আছে 'ঝিঙাফুল ও ঝিঙাফুল', 'ও বুয়ারান', 'ও পরান দা ন লাচাইত' প্রভৃতি। ২০১৫ সালে তাঁর রচিত তঞ্চঙ্গ্যা-বাংলা গানের মিশ্র সংকলন "ঝিঙা ফুল" প্রকাশিত হয়। এটি ছিল তাঁর রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। তিনি বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ইনষ্টিটিউটে (১) তঞ্চঙ্গ্যা কিস্‌সা সংকলন (১ম খ-), (২) তঞ্চঙ্গ্যা সামাজিক প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার এবং আচার আচরণ ও (৩) তঞ্চঙ্গ্যা দাঅ কধা আ মর দি-এক্কয়া শোলোক নামে তিনটি পান্ডুলিপি জমা দিয়েছেন। এছাড়া তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থ চড়ঙ্-চাড়াঙ্, ফুকালাঙ্; বাংলা ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থ সিঙ্গুবী; জাতক থেকে নাটক বোধিকুমার, উন্মাদয়ন্ত্রী, মনিচোর, দেবধর্ম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তঞ্চঙ্গ্যা- বাংলা- ইংরেজী ত্রিভাষিক শব্দকোষ "ইম্‌পোর্টেন্ট ওয়ার্ড বুক" নামক পান্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া তাঁর রচিত গুঁই চান সল্লা নামক একটি রূপক নাটিকা পহ্‌র জাঙাল সাময়িকীর ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির এই গুণীজন এখনও তঞ্চঙ্গ্যা জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা মূলক রচনা প্রস্তুত করে চলেছেন। নিজ উদ্যোগে তাঁর ঝিঙা ফুল পুস্তকটি প্রকাশ করলেও অবশিষ্ট পান্ডুলিপি গুলিস্ব-উদ্যোগে প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে তিনি জানিয়েছেন। আমি মনে করি, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা'র একটি প্রকাশনা শাখা থাকা উচিত, যে শাখার কাজ হবে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে পূর্বে প্রকাশিত লেখকদের দুষ্প্রাপ্য পুস্তকগুলি যেমন প্রকাশ করবে, তেমনি করে নতুন লেখকের মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশেরও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। যত বেশি সংখ্যক তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবে, তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা ও সাহিত্যের মান তত উন্নত হবে বলে আমার বিশ্বাস। শ্রী লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা'র মতো যাঁরা তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং যাবেন তাঁদের সকলের নীরোগ দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের লেখার ইতি টানছি।

সংস্কৃতিঃ প্রেক্ষিত তনচংগ্যা

মিলিন্দ তনচংগ্যা

সংস্কৃতি শব্দটি উচ্চারণ করা খুবই সহজ, তাই বুঝে না বুঝে মানুষ, জেনে না জেনে 'সংস্কৃতি' শব্দটি নানা প্রসঙ্গে নানা স্থানে উচ্চারিত হয়। সংস্কৃতি শব্দটি উচ্চারণ করা যতনা সহজসাধ্য শব্দের তাৎপর্য বুঝা বেশ কঠিন এবং কাউকে বুঝিয়ে দেওয়াও কঠিন। জানা যায় সংস্কৃতি তথা কৃষ্টির মানে Culture এর চৌদ্দটি সংজ্ঞা চালু রয়েছে। [Merrill. p. 120], কিন্তু অবাক হওয়ার বিষয় কোন সংজ্ঞায় বাদ দেওয়ার নয়, শুধু কেউ সমর্থন করেআবার কেউ অগ্রাহ্য করে মাত্র। আবার কোন কোন সংজ্ঞার সমর্থক বেশি আবার কোন কোন সংজ্ঞার সমর্থক সংখ্যা কম বা নগণ্য।

সংস্কৃতি শব্দটার সাথে মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং সর্বোপরি মানসিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ সংস্কৃতিকে এড়িয়ে যাওয়া মানে নিজের সমস্যাদি জিইয়ে রাখা সমান। সংস্কৃতির সাথে মানুষের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, সৌজন্যবোধ, বিনয় বা আদবকেতা প্রভৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংস্কৃতির সাথে মানুষের রুচি অভিরুচির সম্পর্ক আছে। আবার বিজ্ঞানীদের ছোট্ট সংজ্ঞায় সংস্কৃতি মানে উধৎহবফ নবযধারড়ঁৎ বা অর্জিত আচার আচরণ। সংস্কৃতি হলো মানবসম্পদ। তবে হ্যাঁ, মানুষের সংস্কৃতি সাথে জীব বৈচিত্র্য, ভৌগোলিক অবস্থান, মানুষের ভাবনা নিভর করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে সংস্কৃতির সাথে মানুষের আচরণ, দৈনন্দিন জীবন মান ও ভাবনার জগতে প্রভাব রয়েছে। এ যে ভাষা, নাচ গান, পোশাকাদি, খাদ্যাভ্যাস, আচরণ, চলন বলন সবই সংস্কৃতি এক একটি উপাদান। আপনার ভাষা হারিয়ে যাওয়া মানে আপনার স্বাভাবিক জীবন মানে প্রভাব পড়া। আপনার আচরণে পরিবর্তন আসা মানে স্বাভাবিক আচরণ বাধাগ্রস্ত হওয়া। অপরদিকে আপনার খাদ্যাভ্যাস বদলে যাওয়া মানে সংস্কৃতির মধ্যে তার প্রভাব পড়া। কারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন নিত্যদিনের আচরণ, মূল্যবোধের ওপর নিভর করে।

একটা মানুষ বা জাতি চেনা যায় তার ভাষা, আচরণ, মনোভাব, খাদ্যাভ্যাস ও পোশাকাদির মধ্যদিয়ে। বিবাহ সংস্কৃতির একটি বড় অংশ, বিবাহের যে আচার আচরণ ও রীতিনীতি তা সংস্কৃতির পর্যায়ে পড়ে।

আমার লেখা আরম্ভ করেছি সংস্কৃতির পরিচয় নিয়ে তাই আলোচনার মূল বিষয়ও সংস্কৃতি নিয়ে। লেখা শেষ করবো "তনচংগ্যা বিবাহ রীতিনীতি ও সংস্কৃতি" নিয়ে। তবে তার আগে একটু তনচংগ্যা সম্পর্কে জানা যাক।

বাংলাদেশে বসবাসরত অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী মধ্যে তনচংগ্যা জাতি অন্যতম একটি। তনচংগ্যাদের বাস বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলা (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন) ছাড়াও কক্সবাজার জেলায় উখিয়া, টেকনাফসহ চট্টগ্রাম জেলার রাংগুনিয়া

থানার অধীনে রইস্যাবিলি, সাদিক্যাবিলি এলাকায়।

এছাড়াও ভারতের মিজোরাম, ত্রিপুরা, অরুণাচল, মণিপুরের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে এবং আরাকান তথা মায়ানমারের তনচংগ্যাদের বাস আছে বলে জানা যায়।

তনচংগ্যাদের পরিচিতি প্রসঙ্গে বিভিন্ন লেখক ও গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। ড. মনিরুজ্জামান তাঁর লিখিত "তনচংগ্যা ও তাদের ভাষা-রূপ প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে লিখেছেন সাধারণ ভাবে ভাবা হয় তনচংগ্যারা চাকমাদের একটি অংশ বিশেষ। এদের অন্য পরিচয় 'সাপ্রেকুল্যা'। আরাকানের দৈনাকদের সাথেও এদের অর্থাৎ তনচংগ্যাদের বেশ মিল আছে বলে কোন কোন গবেষক মনে করেন। অনেকের মতে 'দৈনাক' প্রাচীন মারমাদের দেওয়া নাম। আরাকান সামন্তরাজ মেঙ্গাদির প্রজা-কুলকেই মারমারা দৈনাক বলে অভিহিত করতো। সুতরাং চাকমা-তনচংগ্যা-সাপ্রেকুল্যা এবং দৈনাকদের মূল উৎস (জড়ড়ঃ) সম্ভবত এক। পাহাড়ে চাষাবাদে এদের মধ্যে ঐক্যের কারণ। তৈনছড়ি (বার তালুক)- তে তৈন (নদী) তং (টং বা পাহাড়)- য়্যা (চাষের কাজ) এই তিন শব্দের সমন্বয়ে এই নামের ঘটা সম্ভব। 'তৈন-তং-য়্যা' থেকেই আধুনিক তনচংগ্যা শব্দের ব্যবহার। তনচংগ্যাদের গছা ১২ টি তন্মধ্যে বাংলাদেশে মাত্র ৭ টি গছার লোকের বাস আছে বলে জানা যায়। আর বাকি ৫ টা গছা ভারত ও বার্মায় আছে বলে জানা যায়। বাংলাদেশের মোট তনচংগ্যা জনসংখ্যা অনুমান করা হয় প্রায় লাখের কাছাকাছি। আপাত দৃষ্টিতে বা আলোচনার প্রসঙ্গে অনেকের বলতে শুনা যায় তনচংগ্যারা চাকমাদের একটি অংশ বা শাখা আর অনেক চাকমা বয়োজ্যেষ্ঠ বলে তনচংগ্যারা আসল চাকমা। আমার আলোচনা সেটা না, কিন্তু বাস্তবতা ও সামাজিক আচরণ এবং ভাষাগত দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে উভয়ের বেশ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তাছাড়া চাকমা জাতির যতগুলি গছা আছে সেখানে তনচংগ্যা নামক কোন গছাও নেই, অত:পর শাখা হওয়ারও প্রশ্নই আসে না! কথার মালা, ভাবপ্রকাশ ভঙ্গি কিঞ্চিৎ মিলতে পারে, তাই বলেতো আর জাতের উপশাখা বলে ধরে নিয়ে চালানো যায়না। যদি এরকম হয় যুক্তির খাতিরে যুক্তিতে বলা যায় মারমা আর রাখাইন এক জাতি বা প্রশ্ন জাগতে পারে কে কার শাখা? কারণ তাদের ভাষা ও পোশাকাদি প্রায় মিল। তবে যাহোক তনচংগ্যা একটি স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠী এবং তা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। তনচংগ্যাদের নিজস্ব পোশাকাদি আছে, যেটা পাঁচ পোশাক নামে সমধিক পরিচিত। আছে নিজস্ব ভাষা, অক্ষর ও বর্ণমালা আছে। তাদের মোট বর্ণমালার সংখ্যা ৩৬ (ছত্রিশ) টি। তন্মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণ ৩১ (একত্রিশ) টি, আর স্বরবর্ণ ৫ (পাঁচটি)। তনচংগ্যারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তারা বেশ সহজ সরল। তনচংগ্যারা সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাসে ভালোবাসে এবং স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার পার্থক্যের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন এভাবে (১৯৮৫)ঃ

ক. চাকমা ভাষায়- দ > তনচংগ্যা ভাষায়- র।

উদাহরণঃ চাকমা- কুদু > তনচংগ্যা- কুরি/কুরু/হুদি (ধন্যাগছা/মো গছা)।

খ. চাকমা ভাষায়- জ, ঝ > তনচংগ্যা ভাষায়- স/শ।

উদাহরণঃ চাকমা- হাজি/ অঝা> তনচংগ্যা- হাশি/ অসা।

অন্যান্য ক্রিয়াবাচক শব্দতেও উভয়ের পার্থক্য মিলে-
তনচংগ্যারা বলে - যাইন, থাইন, খাইন, যাবং, থাবং, ল'উইন, গুরিন।
চাকমারা বলে- যেম, থেম, থেবং, যেবং, ল'অবং, গুরিম প্রভৃতি।

শুধু ভাষাগত পার্থক্য নয় বিবাহের রীতিনীতিতেও তার পার্থক্য আছে। আমার সেই পার্থক্য দেখানোর জন্য নয় আমার অবতারণা শুধু তঞ্চঙ্গ্যা বিবাহ নিয়ে এরপরে পার্থক্য খুঁজার দায়িত্ব আপনার।

তনচংগ্যারা বিয়ে বা বিবাহকে "সাঁ" বা "সাঙা" বলে। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে সচরাচর দু'রকমের বিবাহ দেখা যায়।

(ক) সামাজিক বিবাহ /নিয়মিত বিবাহ ও
(খ) পলায়ন বিবাহ/ অনিয়মিত বিবাহ।

ক. সামাজিক বা নিয়মিত বিবাহঃ

সামাজিক বিবাহ হলো যেটা পাত্র পাত্রীর অভিভাবক বা পিতা মাতার সম্মতিতে এবং সামাজিক রীতিতে বিবাহ সম্বন্ধ ধার্য করা হয় অথবা পাত্র পাত্রী পরস্পর পছন্দের মাধ্যমে অভিভাবক সম্মতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাকেই সামাজিক বা নিয়মিত বিবাহ বলা হয়। সামাজিক বিবাহ আবার দুধরণের হয়।

(১) প্রথাসিদ্ধ বিবাহঃ

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে সামাজিক বা প্রথাসিদ্ধ বিয়ে বহুবিদ আনুষ্ঠানিকতায় আড়ম্বরভাবে হয়ে থাকে। এ বিয়ের ধারাবাহিক কার্যাবলী এরকম হয়ে থাকে। তেম্মাঙ (শলাপরামর্শ), বউ পুছা গরানা (বৌ দেখতে যাওয়া, দাভা (নূন্যতম কিছু অর্থ ধরা হয়), সাজনী বা বোয়ালী সামগ্রী (সাজার জন্য অলংকার বা পোশাকাদি), বউ হছা যানা (বৌ আনতে যাওয়া), জামাই তুলানা (জামাই বরণ), ফংগুরি দেনা (স্বামী স্ত্রী বন্ধন), সেফ ফুদা লনা (আশীর্বাদ নেওয়া), খানা সিরানা (খাবারদাবার সম্পন্ন), বউ লামাই দেনা ও বউ তুলানা (বাপের বাড়ি হতে বউকে বিদায় এবং জামাই বাড়িতে বরণ। তবে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে লক্ষণীয় যে স্বামীও নিজের স্ত্রী আনতে যায়। উক্ত অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন বাধ্য কারণ এগুলি রীতিসিদ্ধ এবং তনচংগ্যা সংস্কৃতির অংশও বটে।

(২) ঘরজামাই তুলে বিয়েঃ

ঘরজামাই তুলে বিবাহ এরকম এখনো তনচংগ্যা সমাজে কম চোখে পড়ে। এটাও প্রথাসিদ্ধ ও নিয়মিত বিবাহ বলে ধরা হয়। তবে এ ধরনের বিয়ে এত্ত আড়ম্বরপূর্ণ হয়না, কনের পিতা বরের কাছে কোন ধরনের দাভা ও সাজনী সামগ্রী দাবি করে না। কনের বাপের বাড়িতে পাত্রকে ঘরজামাই তোলাত পর সামাজিক নিয়মানুযায়ী সাঙা বা সাঁ করা হয়।

খ. পলায়ন বা অনিয়মিত বিবাহঃ

তনচংগ্যা সমাজে পলায়ন বা অনিয়মিত বিবাহ দু'রকমের হয়ে থাকে, প্রথমত হল ছিলানী বিবাহ (সাঁঙ) আর দ্বিতীয়ত হল বউ ঘরে উঠে বিবাহ।

(ক) ছিলানী বিবাহ (সাঁ বা সাঙা)- যুবক যুবতী বা প্রেমিক প্রেমিকা উভয়ের মনোমিলনে এবং তাদেত অভিভাবকদের অসম্মতিতে অথবা এক পক্ষের সম্মতিতে প্রথাসিদ্ধ নিয়মের বাইরে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে নিজেদেরকে স্বামী স্ত্রী রূপে গ্রহণ করাকে তনচংগ্যা সমাজে পলায়ন বা অনিয়মিত বিবাহ (ছিলানী সাঁ) বলে। সাধারণত যুকব যুবতী পালিয়ে গিয়ে দূরে কোন এক আত্মীয় বাসায় আশ্রয় নিতে হয়। এরপরে আত্মীয়ের মারফতে পিতামাতাকে খবরটা জানানো হয় যে ওরা পালিয়ে বিয়ে করেছে। এতে পরে গ্রাম্য শালিস হয়, গ্রামের যুবক যুবতীদের পক্ষে যুব প্রধান বা মুরবিক্ষরা মানে যুবতীর সমাজ যুবক (প্রেমিক) পরিবার বা তার কাছে কিছু অর্থ দাবি করে, যেটা অনেকটা অর্থদণ্ড হিসেবেও বলা যায়। তবে অর্থদণ্ড যেটা বলা হয় বেশি মোটা অংকের হয়না অনেক সময় গ্রামের মানুষেত মনোভাব ও সামর্থ্য বিবেচনায় রাখে।

(খ) বউ ঘরে উঠে বিবাহঃ

অনেক সময় পরিবারের অজান্তে মেয়ে পালিয়ে যায় স্বামীর ঘরে। তবে এখানে কিছু কারণ আছে অ নেক সময় পরিবারের সামর্থ্য অভাবে নিয়মিত বিবাহ পদ্ধিতে কার্যসাধন সম্ভব নয়, তাই পালিয়ে বিয়ে করার মধ্য দিয়ে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা ছেড়ে ফেলা হয়। এতে অল্প ক'জন গণ্যমান্য বা মুরবিক্ষ ডেকে আশীর্বাদসহ খাবার পরিবেশন করলেই বিয়ের কার্য সমাপ্তি হয়।

তবে হ্যাঁ, প্রত্যেক বিয়ের কার্যসম্পাদনের মধ্যে ভান্তেদের মাধ্যমে মঙ্গলসূত্র শ্রবণ করা হয়। এতে সাংসারিক জীবন সুন্দর ও মঙ্গলময় হয় বলে তনচংগ্যারা বিশ্বাস করে।
উপরিউক্ত আলোচিত বিবাহের বাইরে আরো বেশ কিছু প্রচলিত অপ্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি বিবাহ চোখে পড়ে। যেমনঃ **ক) কোর্ট ম্যারেজ বিবাহ, খ) মিশ্র বিবাহ গ) অসাঙ্যা / নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত বিবাহ, ঘ) বিধবা বিবাহ।**

ক. কোর্ট ম্যারেজ মূলতঃ

আদালতের কোন প্রকার আদেশ নয়। আধুনিক তনচংগ্যা সমাজে ইদানীং কোর্ট ম্যারেজ বিবাহ পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত অভিভাকরের অসম্মতিতে বিবাহে ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রী উভয়ে মিলে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অথবা নোটারী পাবলিক -এর সম্মুখে নিজেদেরকে আইনতঃ স্বামী স্ত্রী হিসেবে শপথ পূর্বক ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে প্রাচীনকালের মনোমিলনের পলায়নের আধুনিক সংস্করণ "কোর্ট ম্যারেজ"। যদিও এটি মাত্র শপথনামা, কিন্তু আইনত এ বিবাহ অনলজ্ঘনীয়ও নয়।

খ. মিশ্র বিবাহ:

পার্বত্য জেলাসমূহে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী ছাড়াও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অন্যান্য জনগোষ্ঠী সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে মিশ্র বিবাহ বলে। মিশ্র বিবাহ বন্ধন সচরাচর তনচংগ্যা শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে দৃশ্যমান। এই বিবাহের নেতিবাচক ইতিবাচক দুটো দিক আছে। বিশেষকরে পরবর্তী প্রজন্মে তার বেশ প্রভাব পড়ে এবং তুলনামূলক ভাবে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য হুমকীস্বরূপ।

গ. অসাঙ্যা/নিষিদ্ধ বিবাহ:

তনচংগ্যা সমাজের প্রথা অনুসারে নিষিদ্ধসম্পর্কিত আত্মীয়ের সাথে বিয়ের অপরাধের জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ অপরিহার্য এবং তার শাস্তিস্বরূপ শুকর জরিমানা দিতে হয়। গোপনে বিয়ে করে সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়া স্বামী স্ত্রীরূপে বসবাস করার অপরাধে শাস্তি হচ্ছে অর্থদণ্ড। কাকে বিয়ে করা যাবে কাকে বিয়ে করা যাবেনা তার বিস্তারিত নিচে আলোচনা করা হলো।

ঘ. বিধবাবিবাহ:

তনচংগ্যা সামাজিক প্রথামতে বিধবাবিবাহ অনুমোদিত। একজন বিপত্নীক যেমন বিয়ে করতে পারে, তেমনি একজন বিধবা নারীও আবার বিয়ে করতে পারে। একজন বিধবা যদি তার স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান সন্ততিসহ স্বামীর পরিবারের বা শ্বশুর-শ্বাশুড়ির সাথে একত্রে বসবাস করে তাহলে স্বামীর সম্পত্তি থেকে উক্ত বিধবা আমৃত্যু ভরণপোষণ পাবার অধিকার রাখে। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিয়ে করে যদি স্বামী ও শ্বশুর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে পূর্বস্বামীর সম্পত্তি পাবার অধিকার হারায়। তনচংগ্যা সমাজে একজন বিধবার দ্বিতীয় বিবাহ সামাজীকভাবে রীতিসিদ্ধ। তবে পূর্বেকার মতো দ্বিতীয় বিয়েটাও পিতা বা ভাইয়ের বাড়ি থেকে সম্পন্ন করতে হয়।

এবার আলোচনা করা যাক তনচংগ্যা সমাজে বৈধ অবৈধ বিবাহ কোনগুলি-

১. বৈধ সম্পর্ক বিবাহ:

বিবাহের বেলায় ঘনিষ্ঠ কিংবা দূর সম্পকেৰ্র কোন মামাতো, পিসতুতো, মেসতুতো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ হতে পারে। বড় ভাইয়ের শ্যালিকা, বড়বোনের ননদ কিংবা বড়ভাই মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী বা তালাক দেওয়া স্ত্রীকে বিবাহ করা চলে। শ্যালিকা বা সম্বন্ধীয় বিধবা বা তালাক দেওয়া স্ত্রীকে বিবাহ করা চলে এবং একই পরিবারভুক্ত না হলে পিতামহ বা মাতামহ সম্পর্কিত নাতি নাতনি মধ্যে বিবাহ হতে পারে।

২. অবৈধ সম্পর্ক বিবাহঃ

সহোদরা ভাগ্নি, বিমাতা, ভাগ্নি, ভাইঝি, মাসি, মামী, পিসী, চাচী, জেঠি ইত্যাদি সম্পর্কীয় হলে বিবাহ করা চলেনা। সহোদর ভ্রাতাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে, একই পিতা মাতার ঔরসজাত ছেলেমেয়ের মধ্যে, স্ত্রী বড়বোন অথবা স্ত্রী বিমাতা, স্ত্রী ভাইঝি ইত্যাদি বিবাহ চলেনা এবং সামাজিকভাবে তা নিষিদ্ধ।

বিবাহোত্তর অনেক পরিবার সামাজিক প্রথানুযায়ী এবং পারিবারিক বিপদ আপদ হতে মুক্তি লাভের আশায় "চুমুলাঙ পূজা" করে থাকে। যদিও বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রমতে পূজার কোন নিয়ম নেই, কিন্তু আদিকাল হতে সমাজে প্রচলিত তাই এখনো গ্রামগঞ্জে এর প্রচলন রয়েছে। প্রাচীন তনচংগ্যারা মনে করত তাদের গৃহদেবতার নাম চুমুলাঙ, প্রাচীনেরা মনে করতেন আমাদের দেহছায়া হচ্ছে চুমুলাঙ দেবতা। তিনিই আমাদের পরম রক্ষক, তাই তাকে সন্তুষ্টি রাখার জন্যই চুমুলাঙ পুজার প্রচলন। সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠরা চুমুলাঙ দেবতা অসন্তুষ্ট হলে আমাদের ভয় হয়, বিপদ আপদ বাড়ে ও অশুভশক্তির উপদ্রব বাড়ে। এতে সংসার বা পারিবারিক জীবনে অশান্তি, অসুখ নেমে আসে।

চুমুলাঙ পূজায় একক কোন দেবতাকে পূজা করা হয়না, সাতটি দেবতার সমন্বয়ে চুমুলাঙ দেবতা। তাদের নাম-

১. কালেয়া- মা বা দেবী কালী।
২. পরমেশ্বরী বা ভূমি দেবতা।
৩. লুক্ষী- মা বা ধনদেবী লক্ষী।
৪. মা সরসুত্তি বা বিদ্যাদেবী সরস্বতী।
৫. ভদাইন মা বা রন্ধন দেবতা।
৬. তং ভুদা বা পাহাড় রক্ষাকারী দেবতা এবং
৭. মং - ভুদা বা জলদেবতা।

চুমুলাঙ পূজা সচরাচর পাঁচ ধরনের হয় বলে জানা যায়-

ক। আগ চুমুলাঙ।
খ। ন'আ ঘর' চুমুলাঙ।
গ। ন'আ বসর' চুমুলাঙ।
ঘ। ন'আ বৌ'অ চুমুলাঙ।
ঙ। মান্যা চুমুলাঙ।

এসব প্রথা, রীতিনীতি পূজাপার্বণাদি সমাজের সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করে তুলে। বর্তমান কালের আধুনিক শিক্ষায় ও বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় এসব অনেক রীতিনীতি বা প্রথা সমাজে খুব একটা চোখে পড়েনা বললেই চলে। এতে গ্রামের অনেক বুড়োজনদের বলতে শুনা যায়

এভাবে চলতে থাকলে চুমুলাঙ পূজার প্রথাও হারিয়ে যাবে। তবে কি সংস্কৃতি হারিয়ে যাবে? না যাবেনা সময়ের পরিক্রমায় কিছু ধরণ হয়তো পরিবর্তন হবে। সংস্কৃতি সংজ্ঞায় বলে মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় নিত্যদিনে যা লালনপালন করে, যত্নে রাখে, শ্রদ্ধা করে তাই সংস্কৃতি। মানুষের সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান উৎস হলো ভয় বিস্ময় কল্পনা অনুমান ক্ষতিভীতি প্রাপ্তিলিপ্সাপ্রসূত ভয় ভক্তি ও ভরসা।

অতএব সংস্কৃতি মানুষের সমাজ, পরিবার ও যৌথজীবনে চর্চার নীতিনিয়মের, রীতিরেওয়াজ, প্রথা পদ্ধতি, আচার আচরণ ও দৃশ্য অদৃশ্য কল্পনার মধ্য দিয়ে রক্তের মতো শিরা উপশিরায় বহমান।

সহায়ক গ্রন্থসমূহঃ

১. তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি- শ্রী বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা।/১৯৯৫।

২. পহর জাঙাল - প্রথম সংখ্যা (সম্পাদক পলাশ তনচংগ্যা)/২০০৩।

৩. সাকতুয়াক - আদিবাসী যুবদের সম্মিলিত প্রকাশনা/২০১৫।

৪. সংস্কৃতি ভাবনা- আহমদ শরীফ /২০০৪।

৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন। স্বত্বঃ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন/২০০৭।

তঞ্চঙ্গ্যা কবিতার ছন্দ পরিচয়

সুমনা তঞ্চঙ্গ্যা

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার সাহিত্যভাষার এখনো শূন্যের কৌটায়। এই ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রচেষ্টা চলছে মাত্র। কবিতাই এর প্রথম প্রচেষ্টা। আজকাল নবীন প্রবীণ সকলেই তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় কবিতা রচনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু কবিতার বিভিন্ন উপাদান বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকার কারণে তাদের রচিত কবিতাগুলি কবিতা হয়ে ওঠতে পারে না, হয়ে যায় কেবল দুয়েকটি শব্দের ব্যঞ্জনা মাত্র। কবিতার এসকল বিষয় সম্পর্কে কাব্যপ্রেমী ও ভাবী কবিকে ধারণা দিতেই আজকের এই প্রয়াস। আশা করি, এই রচনাটি কাব্যপ্রেমী ও ভাবী কবি সকলের অনেক কাজে আসবে।

কবিতায় রসঘন ও শ্রুতিমধুর বাক্য প্রয়োগ করা আবশ্যক। বাক্য সমুহের সুশৃঙ্খল বিন্যাসের ফলে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তাই ছন্দ। উপযুক্ত ছন্দ প্রয়োগ করতে পারলেই পাঠক কবিতাটি পড়ার সময় এক ধরনের ধক্ষনিমাধুর্য উপভোগ করেন। এতে তিনি কবিতাটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন যা তাকে আরও অধিক সংখ্যক কবিতা পাঠের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। ছন্দের বিভিন্ন উপকরণ আছে। যেমন- অক্ষর, যতি, পর্ব, মাত্রা, শ্বাসাঘাত, পদ, চরণ, মিল এবং স্তবক।

প্রচলিত অক্ষর ও ছন্দের অক্ষরের মধ্যে তফাত আছে। বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে বা এক ঝোঁকে শব্দের যে অংশটুকু উচ্চারিত হয়, ছন্দের বেলায় তাকেই অক্ষর বলে। এই অক্ষর অনেকটাই ইংরেজি ঝুষষধনষব'র মত। যেমন-

খুলিল=খু+লি+ল=৩ অক্ষর।
চেরেত্তার= চে+রেত্+তার্ = ৩ অক্ষর।
এক্খান= এক্+খান্=২অক্ষর।

মনে রাখা দরকার- ছন্দ সবসময় অক্ষর বা উচ্চারণের সাথে সম্পর্কিত, বানানের সাথে নয়। এক নিশ্বাসে কোন কিছুই ঠিকমত বলা সম্ভব হয় না। এজন্য মাঝে মাঝে বিরতি নিতে হয়। কবিতা পাঠের সময় শ্বাসগ্রহণের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট সময় পরপর যে উচ্চারণ বিরতি নেয়া হয়, তাকে ছন্দযতি বলে।

ছন্দযতি দুই প্রকার- হ্রস্বযতি ও দীর্ঘযতি। অল্পক্ষণ বিরতির জন্য বাক্য বা পদের মাঝখানে হ্রস্বযতি এবং বেশিক্ষণ বিরতির জন্য, বাক্য বা পদের শেষে দীর্ঘযতি ব্যবহৃত হয়। হ্রস্বযতিকে। ও দীর্ঘযতিকে।। চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়।বাক্য বা পদের এক হ্রস্বযতি হতে আরেক হ্রস্বযতি পর্যন্ত অংশই পর্ব। যেমন-

খুলিল কবাল । চেরেত্তার গুণে । পালুং এক্খান চা। উরি ।।
কুধি দিলাক মে । কুধি দিলাক মে । ন পাইল্লুং ঠার্। গুরি।।

(গুরু; চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা)

এখানে, ছন্দযতি দ্বারা দুটি পর্বকে আলাদা করা হয়েছে। প্রতি চরনে ৩টি পূর্ণপর্ব ও ১টি অপূর্ণ পর্ব বিদ্যমান।

একটি অক্ষর উচ্চারণে যে সময় প্রয়োজন হয়, তাকে মাত্রা বলে। বিভিন্ন কবিতায় এই মাত্রার সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়, একেক ছন্দে একেক অক্ষরের মাত্রাসংখ্যা একেক রকম হয়। মাত্রার ভিন্নতাই কবিতার ছন্দগুলোর ভিত্তি।

দীর্ঘযতি ছাড়াও দুই যতির মধ্যবর্তী বিরতির জন্য মধ্যযতি ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘযতি দ্বারা আলাদা করা দুইটি অংশই চরণ; আর চরণের মধ্যযতি দিয়ে পৃথক করা অংশগুলো পদ। চিহ্ন দ্বারা মধ্যযতি চিহ্নিত করা হয়। যেমন-

আঐত জায়ের । ও লোক্কোবি ম পআবার । নাঙানি।।
থোই দিবে । আওসেগি যা ত মনর । সাধুনি।। (মুহাম; চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা)

অনেকগুলো চরণ নিয়ে একটি স্তবক গঠিত হয়। সাধারণত, একটি স্তবকে একটি ভাব প্রকাশিত হয়। একটি কবিতার পূর্ণ অর্থ একটি স্তবকেও শেষ হতে পারে, আবার একাধিক স্তবকও প্রয়োজন হতে পারে। একটি কবিতায় স্তবকের সংখ্যা কত হবে তার কোন সীমাবদ্ধতা নেই।

প্রথম স্তবক

'কবাল লেহা ব্যাক্ বেঞা'
মনে মনে বুশানা গম্ ইয়ান্।
যে থায়্ বানা কবাল আশায়্
মুসুঙত্ আহ্বার্ তার্ জীবনান্।।

দ্বিতীয় স্তবক

ব্যাক্খুনে আঐত্ গরন্ দুনিয়াত্
মুসুঙত্ পাবার্ ভাত্-পানি।
আঐচ উবুরে আঐত্ থায়্ পুড়ি
ন চালেয়্য উদা পড়ে কানি।।

তৃতীয় স্তবক

জগত্ সংসারান্ ব্যাক্ এক্ রং
দুখ্ বাদে কন সুখ্ নাই।
দুখ্ বাদে যে সুখ্ তআয়্
তাত্তুন্ গরা পড়ে হায়্ হায়্।।

(ওইত্; চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা)

উপরের কবিতায় প্রতি চার চরণ মিলে একেকটি সুনির্দিষ্ট ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এগুলোকে একেকটি স্তবক বলে। যেমন, প্রথম স্তবকটিতে কবিতাটির মূলভাব প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকে কবিতাটির ভাব প্রসারিত হয়েছে। তৃতীয় স্তবকে জীবনের বাস্তবতা বা পরিণতি ফুটে উঠেছে। এভাবে কবিতার একেকটি স্তবকে একেকটি ভাব বর্ণিত হয়।

একাধিক পদ, পর্ব বা চরণের শেষে একই রকম ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের ব্যবহারের নাম 'মিল'। অলঙ্কারের ভাষায় একে বলে অনুপ্রাস। সাধারণত 'মিল' পদের শেষে থাকে। আবার শুরুতে বা মাঝেও মিল থাকতে পারে। পদের শেষে মিল হলে একে বলা হয় 'অন্ত্যমিল'। যেমন-

ঘিন মেরে ঘিন । ঈশা ঈশা ঘিন।।
দঅ শাত্তি দঅ । মনদক্ক বিন।।
মে তমার্ আর্ । নাই ডরাবার্ ।।
ন গুইজ্য । কেনা বয়্ ।।
ম পাপ্ফানি । ওক্ খয়্ ।।

(আমন-চশা; চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা)

এখানে, প্রথম চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের শেষের পদ দুটিতে অন্ত্যমিল (অ) আছে; দ্বিতীয় চরণের প্রথম দুই পদের শেষেও অন্ত্যমিল (অ) আছে। আবার প্রথম দুই চরণের শেষের পদেও অন্ত্যমিল (অ) বর্তমান। অপরদিকে তৃতীয় চরণের দুটি পর্বের অন্ত্যমিল (আর্। শেষ দুটি চরণের অন্ত্যমিল (অয়্)।

ছন্দের প্রকারভেদ

কবিতার ছন্দ মূলত ৩টি- স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত। তবে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় রচিত কবিতাগুলোতে সাধারণত এই ছন্দচিন্তা অনুপস্থিত। আমি মনে করি, কবিতার উপকরণ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই এর মূল কারণ। শুধু ধ্বনিমাধুর্যটুকু অটুট রাখার চেষ্টাতেই তঞ্চঙ্গ্যা কবিতাগুলো সৃষ্টি হয়ে চলেছে। যারা কবিতা লিখছেন, তারা নবীন এবং অনভিজ্ঞ কবি। ছন্দ সম্বন্ধে নিজেকে অনভিজ্ঞ রেখে কবিতা রচনা করার মধ্যে একটি ভাষার কবিতার উন্নতি ঘটতে পারে না। একটি কবিতাকে রসঘন ও আকর্ষণীয় করতে হলে অবশ্যই ছন্দের বিভিন্ন উপকরণ ও প্রকারভেদ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা এবং সেগুলোর সার্থক প্রয়োগ প্রয়োজন।

স্বরবৃত্ত ছন্দ

স্বরবৃত্ত ছন্দ দ্রুত লয়ে আবৃত্তি করতে হয়। মূল পর্ব সাধারণত ৪ মাত্রার হয়। সব অক্ষর ১ মাত্রা গুনতে হয় প্রতি পর্বের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে। বাংলা কবিতায় এই ছন্দের বহুল ব্যবহার থাকলেও তঞ্চঙ্গ্যা কবিতায় এই ছন্দ এখনো সার্থক প্রয়োগ নেই। সম্ভাবনাময়ী তরুন কবি চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা'র 'অপার'পক্ষে' কবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

মনত্ বানা । শমন্ছড়া । যাং বুনি ।। (৪+৪+৩)
এহাক্কন্‌গি । জিরান্ টিরান্ । পাং যুনি।। (৪+৪+৩)
ঝক্কাঝক্কি। কামত্ থাক্কে । য়্য বুনি যাং।। (৪+৪+৪)
কমলেসে । ই কাম্ গরং। ক্ষাইত্ ন পাং।। (৪+৪+৪)

উপরের চরণগুলোতে মূলপর্বে মাত্রাসংখ্যা ঠিক থাকলেও কবিতাটির শেষ দিকে গিয়ে তা বিচ্যুত হয়ে যায়। তখন ধক্ষনিমাধুর্যের দিকেই কেবল লক্ষ্য রাখা হয়েছে, মাত্রা এত গুরুত্ব পায়নি। যেমন-

যাঙর্ মুই । কুম্ টুম্ লোই । পানি বআ।। (৩+৩+৪)
কিংবা, কবাল লেহা । কন্না ভূচায় । পারেয়ায়্।। (৫+৪+৩)

উপরের দুটি চরণে মাত্রা ঠিক রাখা হয়নি। প্রথম চরণে মূলপর্ব দুটি অপূর্ণ। দ্বিতীয় চরণে প্রথম মূলপর্বটিতে ১ মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে গেছে। পুরো কবিতাটিতে এ রকম আরও অনেক অনেক বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

বাংলা কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মূলপর্ব ৪, ৫, ৬ বা ৭ মাত্রার হয়। অক্ষরের শেষে স্বরধক্ষনি থাকলে ১ মাত্রা গুনতে হয়; আর অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধক্ষনি থাকলে ২ মাত্রা গুনতে হয়। উদাহরণ- চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা'র পাত্তুরু তুরু গ্রন্থের 'গুরু' কবিতা।

খুলিল কবাল্ । চেরেত্তার্ গুণে। পালুং এক্‌খান্ চা । উরি।। (৬+৬+৬+২)
কুধি দিলাক্ মে । কুধি দিলাক্ মে । ন পাইল্লুং ঠার্ । গুরি ।। (৬+৬+৬+২)

কবিতাটির মূল পর্ব ৬ মাত্রার। প্রতি চরণে তিনটি ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্ব এবং একটি ২ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব আছে।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অক্ষরের শেষে স্বরধক্ষনি থাকলে ১ মাত্রা গুনতে হয়। অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধক্ষনি আছে, এমন অক্ষর শব্দের শেষে থাকলে ২ মাত্রা হয়; শব্দের শুরুতে বা মাঝে থাকলে ১ মাত্রা হয়। কোন শব্দ এক অক্ষরের হলে, এবং সেই অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধক্ষনি

থাকলে, সেই অক্ষরটির মাত্রা ২ হয়। মূলপর্ব ৮ বা ১০ মাত্রার হয়। উদাহরণ-

বুড়াবুড়ির্ কধা ধাঅত্ । ফুদি আহে ফররক্।। (১০+৮)
দেবেদায়্য ন বুশন্ কন্ । মেলা-মন হ্অদরক্।। (১০+৮)
মুই-দ লোক্কোবি কিচ্ছু নয়্। সামান্য এক্ মরত্। (১০+৮)
মেলা-মন্ বুশেপা ওইত্ । নাই মর্ খেমদত্।। (১০+৮)

(মুহাম; চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা)

কবিতাটির মূল পর্ব ১০ ও ৮ মাত্রার। এখন, মাত্রা গণনা করলে দেখা যায়, প্রথম চরণের,

প্রথম পর্ব- বু+ড়া+বু+ড়ির্ = ৫ মাত্রা; ক+ধা+ধা+অত্ = ৫ মাত্রা। এখানে পর্বের শেষে ব্যঞ্জনধক্ষনিযুক্ত 'ড়ির্' ও 'অত্' অক্ষর থাকায় ২ মাত্রার হয়।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অনেকগুলো রূপভেদ আছে- পয়ার, মহাপয়ার, ত্রিপদী, দিগক্ষরা, একাবলী, সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

সনেট

সনেট সর্বদা ১৪ মাত্রার চরণ হয়। সাধারণত দুই স্তবকে যথাক্রমে ৮টি ও ৬টি বা ১৪টি চরণ থাকে। প্রথম আটটি চরণের স্তবককে অষ্টক ও শেষ ৬টি চরণের স্তবককে ষটক বলে। এছাড়া সনেটের অন্ত্যমিল ও ভাবের মিল আছে এমন চারটি চরণকে একত্রে চৌপদী, তিনটি পদকে ত্রিপদীকা বলে। সনেটের অন্ত্যমিল সুনির্দিষ্ট। দুইটি স্তবকে যথাক্রমে ভাবের বিকাশ ও পরিণতি থাকতে হয়; অর্থাৎ, প্রথম স্তবকে কোন সমস্যা বা ভাবের কথা বলা হয়, আর দ্বিতীয় স্তবকে সেই সমস্যার সমাধান বা পরিণতি বর্ণনা করা হয়। সনেটের ভাষা সর্বদা মার্জিত এবং ভাব গম্ভীর হতে হয়।

সনেট মূলত ৩ প্রকার- পেত্রার্কীয়, শেক্সপীয়রীয় ও ফরাসি সনেট; এই ৩ রীতির সনেটের প্রধান পার্থক্য অন্ত্যমিলে। এছাড়া ভাব, বিষয় ও স্তবকের বিভাজনেও কিছু পার্থক্য আছে। নিচে ৩ প্রকার সনেটের অন্ত্যমিলের পার্থক্য দেখান হলো-

পেত্রার্কীয় রীতি ঃ ক+খ+খ+ক ক+খ+খ+ক চ+ছ+জ চ+ছ+জ
শেক্সপীয়রীয় রীতি ঃ ক+খ+ক+খ গ+ঘ+ঘ+ঘ চ+ছ+চ+ছ+জ+জ
ফরাসি রীতি ঃ ক+খ+খ+ক ক+খ+খ+ক গ+গ চ+ছ+চ+ছ

উদাহরণ হিসেবে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে পহ্র জাঙাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা'র রানিপিদি ও হ্শাসরা নামক কবিতা দুটি পাঠের অনুরোধ রইল।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় এখনো অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচিত হয়নি।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাবের প্রবাহমানতা। কবিকে একটি চরণে একটি নির্দিষ্ট ভাব প্রকাশ করতেই হবে- তা নয়, বরং ভাব এক চরণ থেকে আরেক চরণে প্রবহমান এবং

চরণের মাঝেও বাক্য শেষ হতে পারে। যেখানে যেই বিরামচিহ্ন প্রয়োজন, তা ব্যবহার করা এই ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দে অন্ত্যমিল থাকে না। মিল না থাকলেও এই ছন্দে প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা নির্দিষ্ট (সাধারণত ১৪) এবং পর্বেও মাত্রা সংখ্যা নির্দিষ্ট (সাধারণত ৮+৬)। অন্ত্যমিল না থাকা এবং ভাবের বা বাক্যের প্রবহমানতাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান দুইটি বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠের অনুরোধ রইল।

গদ্যছন্দ

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার কবিতাগুলি মূলত গদ্যছন্দেই রচিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- গদ্যের মধ্যে যখন পদ্যের রঙ ধরানো হয় তখন গদ্যকবিতার জন্ম হয়। গদ্যছন্দে পর্বগুলো নানা মাত্রার হয়, সাধারণত পর্ব-দৈর্ঘ্যে কোন ধরনের সমতা বা মিল থাকে না। পদ ও চরণ যতি দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং বিরামচিহ্ন দ্বারা নির্ধারিত হয়; এই বিরামচিহ্ন উচ্চারণের সুবিধার্থে নয়, বরং অর্থ প্রকাশের সুবিধার্থে ব্যবহৃত হয়। গদ্যকবিতা গদ্যে লেখা হলেও তা পড়ার সময় এক ধরনের ছন্দ বা সুরের আভাস পাওয়া যায়। গদ্যে লেখা হলেও এর পদবিন্যাস কিছুটা নিয়ন্ত্রিত ও পুনর্বিন্যাসিত হতে হয়।

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায়ও কবিতার বিভিন্ন উপাদান ও বিভিন্ন প্রকার ছন্দের নাম দেয়া আবশ্যক। কবি শ্রী চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা বিভিন্ন প্রকার ছন্দের নামকরণ করেছেন এভাবে, স্বরবৃত্ত ছন্দ (সরাবান্ ছন্দ), মাত্রাবৃত্ত ছন্দ (মাবা ছন্দ), অক্ষরবৃত্ত ছন্দ (অক্‌খরা ছন্দ), অমিত্রাক্ষর ছন্দ (মুক্তমিল্ ছন্দ) ও গদ্যছন্দ (সেত্তারাং ছন্দ)। কবিতার এসকল উপাদান ও ছন্দের জ্ঞান অন্তরে ধারণ করে যদি কোন ভাবী কবি কাব্য সাধনায় ব্যাপৃত হয়, আশা করা যায়, তঞ্চঙ্গ্যা কাব্য সাহিত্য অদূর ভবিষ্যতে স্বজাতির পাশাপাশি বিজাতীয় বিজ্ঞগণের প্রশংসা কুড়াতেও সক্ষম হবে। আমি সেই দিনটির অপেক্ষায় রইলাম।

লেখক পরিচিতি ঃ ছাত্রী, বিএসএস, দ্বিতীয় বর্ষ, কর্ণফুলী ডিগ্রি কলেজ, কাপ্তাই।

আজ এবং আগামী কালের অপেক্ষা

জগদীশ তঞ্চঙ্গ্যা

মানুষ ধরনীর শ্রেষ্ঠ জীব। প্রত্যক মানুষ হয়ে ওঠে সুখের সন্ধানি। মরুভুমিতে পানীয় জল খোজার মতই মানুষ সুখের অন্বেষনে মজগুল। ধন, সম্পদ, বিত্ত, বৈভব ইত্যাকার সম্পদের অধিকারী হয়ে মানুষ সুখী হতে চাই। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতির মোহে মানুষ ভুলে যাই যে, বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়েও মানুষ প্রকৃত সুখী হতে পারেনা। সুখী হতে হলে তার ভিতরকার আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে নিরহংকার হতে হবে। বিসর্জন দিতে হবে তার আপন সুখান্বেষা। নিজের কর্ম নিয়োজিত করতে হবে পরহিতে। দীন দুঃখীর ব্যাথা দুর করার মাঝে খুজতে হবে আত্মসুখ। অপরের উপকারের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। অপরের দুঃখ দুর্দশা দুর করার মধ্যই প্রকৃত অর্থে মানুষের আত্মিক সুখ নিহিত। কিন্তু আজ মানব সমাজের নিজের স্বার্থে নিহিত প্রকৃত সুখ। তার মাঝে শ্লোগান রচনা হয়ে গেছে- জোড় যার মুলুক তার। প্রকৃতি আজ হয়ে উঠেছে হিংসা। ব্যক্তি স্বার্থের মোহে অন্ধের অন্ধত্ব মানুষ। সবাই আজ নিজের ব্যাস্ততা আর বিপুল আলোচনা ও নানামুখী ব্যাখায় নতুন নতুন তাৎপর্যে অভিষিক্ত। একই সাথে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের স্মারক। বিসর্জন দিই মানবতা আর বিবেক বোধ। মহত্ব গুনের সাথে আর কালে কালে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেষণার আলোকে মানবতার খাটিয়ে যে কল্যাণ সাধন তা থাকে আত্মা থেকে শতমাইল দুরে। শূন্য নদীর মতো মানবতাকামী ব্যক্তিসত্বা আশাহত হৃদয়ে গুমড়ে মরে।আসলে দোষ কার? ব্যাক্তি সমাজের নাকি পদমর্যাদার? (?) প্রশ্ন থেকে যায়। যেখানে একদিকে সাম্যবাদ আর মানবতার জয়গান ও অসাম্প্রদায়িকতার স্বপ্ন দেখে সেখানে প্রতিনিয়ত সাম্প্রদায়িকতা আর মৌলবাদের উন্মেষ! সেখানে আজ সাম্প্রদায়িকতা ব্যবহার করে করা হচ্ছে রাজনীতি। শোষণ করা হচ্ছে সাধারন মুক্তিকামী মানুষদের। উষকে দিচ্ছে একের বিরুদ্ধে অন্যকে। ধর্ম, বর্ণ আর গোষ্ঠীর দোহায় দিয়ে মানুষ পরষ্পর কে থেলে দিচ্ছে দুর থেকে বহু দুরে।একে অন্যর মাঝে স্থাপন করা হচ্ছে দুরত্বের বিশালতার দেয়াল। তারপর ও স্বপ্ন বুনা কিন্তু মানুষের স্বভাব। কেননা মানুষ হচ্ছে স্বপ্ন বিলাসী। তবে আজ নিজের মধ্যে ভয় জাগে স্বপ্ন দেখার মাঝে। কেননা, যে স্বপ্ন রাতের গহবহর আর বিরম্বনার মাঝে ধুলিসাৎ হয়ে যায় সেখানে স্বপ্ন দেখা কী বা স্বার্থকতা? আমরা যুগের পরিবর্তনে পরিবর্তন হচ্ছি ঠিকই কিন্তু নিজের বিবেক পরিবর্তন হচ্ছে বলে সন্দেহ থেকে যায়।যেখানে চলছে রাজনীতির প্রভাব আর ক্ষমতার অপব্যবহার, চলছে ধর্মের নামে অধর্মের চর্ষা। আবারো প্রশ্ন থেকে যায় নিজের বিবেক আর মানবতা প্রেমিদের কাছে। আগেকার দিনে যেখানে মানুষের মধ্যে ছিল অকৃত্রিম সৌহাদ্যের বন্ধন। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ খ্রিষ্টানদের বন্ধন ছিল সর্বদা অটুট। সকলের নিজস্ব । ঐতিহ্য মন্ডিত সংস্কৃতির মধ্যে আহবান করে সকলের চিত্ত আনন্দে উদ্ধেলিত হতো। কখনো কিনা বিবেদ ঘটলে সাধারন মানুষ গ্রামের প্রধানের কাছে বিচার পেত। সহজ সরল ধর্ম বলে বলিয়ান এ মানুষ গুলো এখনকার মতো স্বার্থপরতা, ব্যাক্তিস্বার্থ আর আত্মকেন্দ্রিক দুর্ণীতির বলিয়ান হয়ে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখত না। কিন্তু

আজ কঠিন বাস্তবতার মানবিক অশান্তির শিকার সমাজ। তাহলে দিনের পরিবর্তন ছিল সমাজের অভিশাপ? নাকি উন্নয়নের দ্বারা? মানুষ শান্তি প্রিয়, মানবতা প্রিয়। কেউ চাইনা জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকিতে ঘটে যাওয়া নৃশংসতার স্মৃতি। কেউ চাইনা আনবিক বোমার আঘাতে মৃত কিংবা প্রজন্ম পরম্পরার পঙ্গুত্ব বরনকারী মানুষের মতো আত্মনাদ আর হা হা কারের আহাজারি। প্রতিটি মানব কল্যাণ আর শান্তিকামী মানুষের কাছে একটাই চাওয়া, সুখ সমৃদ্ধি আর মানবতার কল্যাণ সাধন। সবাই চাই হিংসা, লোভ আর ইর্ষা নামক করাল রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পাক দেশ আর সমাজ। হিংসা আর স্বার্থপরতার করাল রাহুগ্রাসে যাদের হৃদয় মানবতা শূন্য তাদের অন্তরে গজে উঠুক অফুরন্ত ভালোবাসা আর মানবতার জয়ধবনি। পৃথিবী মানব সমাজ গড়ে উঠুক অফুরন্ত ভালোবাসা আর মানব প্রেমে। অভাগা মানুষ জেগে উঠে পাহাড়ি ঢলের মতো ভাসিয়ে দেবে সকল অন্যায়। স্বপ্ন দেখবে নিজের মতো আর বাস্তব রুপ দেবে মানব কল্যাণে। মানবজাতি বেচে থাকুক সামষ্টিক চেতনায় প্রবাহমান রুপের সত্যর মধ্যে। বেচে থাকুক ব্যক্তি মানুষের সৃষ্টি আর মানব সভ্যতার ধারায় মানবতার পরিপুষ্ট হয়ে। যেখানে স্বপ্ন আর জীবন হবে অর্থবহ। জয় হবে মানবতার। শ্লোগান হবে একটাই-

নয় কোন হানাহানি,
নয় কোন সংঘাত
চাই শুধু জাতি প্রেম
এটাই মোদের অঙ্গীকার..

ছাত্র: রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ।

ভ্যালেন্টাইনস-ডে'র ভীতি

অজিত কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
১৩-০২-০৬ খ্রি.

অশোক বাবু আরামদায়ক লেপ-তোষকে শুয়েও বিছানায় এ পাশ ও পাশ করছেন। মাঘের শেষ। কন্ কনে শীতের রাতে সচরাচর মানুষ আরাম বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়েই শো'তে আরাম বোধ করে। কিন্তু অশোক বাবু ক্ষেত্রে বিপরীত। বার্ধক্য শোঁয় শোঁয় বয়স। পিটে ব্যথা! দাঁতে ব্যথা! আর কত কি। অনিদ্রায় জাগরণে মাথায় কত কি যে চিন্তার উদ্রেক। অতীত ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা চিন্তা এসে ভীর করছে তাঁর মনে। লেপ টানা টানিতে গিন্নীর নিদ্রাভঙ্গের কারণে বার বার বিরক্তি ভাব প্রকাশ করছেন গিন্নী। অবশেষে অশোক বাবু "টস" করে বেড সুইস অন করলেন। পাশের বেড- সাইড থেকে রিডিং গ্লাস আর সেদিনের (১৩/০২/২০০৬) তারিখের খবরের কাগজখানা উঠিয়ে চোখ বুলাতে থাকেন অশোক বাবু। এটা তাঁর অভ্যাস। ঘুম না আসলে সময়-অসময় লাইট জ্বালিয়ে বই পড়া, পেপার পড়া ইত্যাদি এই দিনের গিন্নীর সাথে মাঝে মধ্যে বসা হয়। খবরের কাগজে চোখ বুলাতে বুলাতে ভ্যালেন্টাইস্-ডে সম্পর্কীত একটা আর্টিকেল চোখে পড়ে যায় তাঁর। অতি আগ্রহে কিছু দূর পড়ে ফেলেন তিনি। লেখকের প্রাঞ্জল ভাষা, শব্দ চয়নে, বাক্য প্রয়োগে নৈপুন্যতা, উপস্থাপনা ও বিষয়বস্তু সবকিছু মিলিয়ে বড়ই মজা লাগছিল আশোক বাবুর। তবে মনের এক কোণে কেমন যেন অজানা ব্যথায় বারে বারে অশোক বাবুর বড়ই মজা লাগছিল। যেহেতু অশোক বাবুর জীবনে ভ্যালেন্টাইস-ডেটা কেমন যেন ভীতির বিষয় হয়ে রয়েছে; যা ঘুরে ফিরে বছরে এসে যায়, আর বারে বারে আঘাত করে তাঁর মনকে।

ঘটনাটা এ রূপ......

দিনটা ছিল মাঘের শেষের এমনি একটা দিন। বেশ ক'বছর আগের ঘটনা। বেলা দ্বি-প্রহর। প্রকৃতির মা লান্স আওয়ারে বাসায় এসেছেন। এসেই দেখতে পেলেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া ছেলে "প্রকৃতি" একজন অপরিচিত মেয়ের সাথে বৈঠকখানায় সোফায় বসে কি যেন আলাপ করছে। প্রকৃতির মাথায় চুল উষ্ক-শুষ্ক! ছেলেকে এ ভাবে দেখে মায়ের মনে প্রশ্ন জাগে-" এইতো সবে মাত্র তিনদিন আগে ছেলে আগামী মাসের খোরাকীসহ বিদায় হয়েছিল হোস্টেলের উদ্দেশ্যে; তবে কেন অসময়ে বাড়িতে আসা?" অপরিচিত মুখ দেখে মায়ের মনে নানা প্রশ্ন ঘুর পাক খাচ্ছিল। মা কাছে ঘেসে শোফায় বসতে না বসতে প্রকৃতি বলে-" এই তো মা" বলে নবাগতকে মায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। মেয়েটি বিনম্র ভাবে উঠে এসে পা ছুঁয়ে প্রকৃতির মাকে প্রণাম করে। মা ইতস্ততঃ স্বরে জিজ্ঞেস করেন-"কখন এসেছ বাবা?" ছেলে বলে-" এইতো কিছুক্ষণ হল।" দুরু দুরু বক্ষে সংযত স্বরে আমতা আমতা করে ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন-" এ কে বাবা? ছেলে সহজ ভাবে বলার চেষ্টা করে" ও আমার ক্লাশ মেট; খাগড়াছড়ি দেখতে এসেছে"। আমরা বিকেলে চলে যাবো, ওর নাম জ্যোতি। মায়ের মনে ভীষণ দুঃচিন্তা-" কি জানি কখন কি পরিচয় দিয়ে বসে ছেলে !"

শত সংযত থাকার চেষ্টা করেও প্রকৃতির মা চুপ থাকতে পারলেন না-" কি বিষয়ে পড়াশুনা করছো মা?" বলে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেন। মেয়েটি কোমল কণ্ঠে বলে-" সিভিল পড়াশুনা করছি।" মা আবার প্রশ্ন করেন- তোমার দেশের বাড়ি?" মেয়েটি বলে-সিলেটের প্রপারে"। বাবা মা'রা কি করেন? প্রকৃতির মা পুনঃজিজ্ঞেস করেন। মা বাবা দুজনই চাকুরী করেন"- বলে জানায় মেয়েটি।

কণ্ঠে সিলেটি ভাষায় প্রভাব ফুটে উঠে। বাবা কলেজে অধ্যাপনা করেন আর মা ব্যাংকে চাকরী করেন। আর আলাপ না বাড়িয়ে মা রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজ থেকে কিছু খাবার আর ঠান্ডা পানি দিয়ে রান্নার তদারকীতে চলে যান। মিনিট দশেক পর প্রকৃতির বাবা এলেন। বাবা এসেই হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন; কখন এসেছ বাবা" এই তো কিছুক্ষন হল"- বলে প্রকৃতি। নবাগতের দিকে মুখ করে বাবা জিজ্ঞেস করেন- এ কে বাবা?" কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ সুরে ছেলে বলে-" ও আমার ক্লাশমেট জ্যাতি। জ্যোতি এসে অশোক বাবুর পা ধরে প্রণাম করে। বাবা আর দেরী না করে, তোমরা বসো, বলে সোফা ছেড়ে মূল ঘরে প্রবেশ করলেন। রান্না ঘরে ব্যস্ত স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন- মেয়েটা কে? বুদ্ধিমতি প্রকৃতির মা ব্যাপারটা এড়িয়ে সহজ ভাবে বললেন- খাগড়াছড়ি দেখতে এসেছে প্রকৃতির ক্লাশমেট জ্যোতি বিকেলে চলে যাবে তারা। অশোক বাবু যে গম্ভীর হয়ে উঠলেন স্ত্রী তা স্পষ্ট আঁচ করতে পারলেন। অশোক বাবুর মনে নানা দুঃচিন্তা ভর করতে থাকে। অফিসে কাজের তাড়া আছে তাই দেরী না করে মুখে দুটা ভাত পুড়ে তাড়াহুড়ো করে অফিসের দিকে পা বাড়ান।

বাবা চলে যাওয়ার সাথে সাথে রান্নাঘরে ব্যস্ত মাকে এসে প্রকৃতি বলে- মা! কি বলে ব্যাপারটা বলি... আমতা আমতা করে বলে.. মা! আমরা আসলে পরস্পর পরস্পরকে আমাদের অজান্তে কখন যেন পছন্দ করে ফেলেছি! মা এ কথা শুনে আকাশ থেকে পড়েলেন। মা হতভম্ব সুরে বলেন- তোমরা যা ভাবছো বাবা! তা কি করে হয়? কখন থেকে এ সব ঘটনা? প্রকৃতির দু'চোখ বেয়ে যে অশ্রু ঝড়ে পড়ছে তা পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে মা। কঠিন পরীক্ষার মত মনকে শক্ত রেখে মা বললেন- দেখ বাবা তোমরা এখনও ছাত্র-ছাত্রী। সামনে অনেক পড়াশুনা আছে। মাঝ পথে সম্পর্ক হলে ক্ষতি ছাড়া কিছুই হবে না। তোমরা আরও চিন্তা করে দেখ, কারণ তোমরা দু'জনে দুই জনগোষ্ঠীর লোক। ধর্ম এক হলেও পারিবারিক ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান দু'জনের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। তোমাদের এখনও অনেক ভাববার সুযোগ ও সময় আছে। তোমরা এখন ছোট নও; বিবেক খাটিয়ে নিখুঁত ভাবে ভেবে চিন্তে এঁগোতে হবে। তোমরা তাড়াতাড়ি চলে যাও' বেলা শেষ হয়ে আসছে। প্রকৃতি মায়ের মানসিক অবস্থা দেখে দ্বিতীয় বার অনুনয় বিনয় করার যৌক্তিকতা খুঁজে পেলনা। অনোন্যপায় হয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে মনস্থির করল। বিকেল ৩টার দিকে বুয়েটের উদ্দেশ্যে খাগড়াছড়ি টাউন ছাড়ল তারা। অফিসে এসেছ? আরও কত কি মাথায় ভীর করতে থাকে তার। সন্ধ্যায় স্বামী স্ত্রী অফিস থেকে ফিরেন তাঁরা। বাসায় থম থমে ভাব! যে যার কাজে ব্যস্ত হতে পড়েন চিন্তিত মনে। রান্না বান্না শেষে খাওয়া দাওয়ার পর

Scanned with CamScanner

স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন। তারা কয়টায় রওনা দিয়ে ছিল? স্ত্রী সুমতি বলেন- ৩টার দিকে। কিছু আঁচ করতে পেরেছ কি? ছেলে কেন একে নিয়ে এসেছে? বললেন অশোক বাবু। স্ত্রী সুমতি আমতা আমতা করে বললেন- যা অনুমান করেছি ঠিক তাই হয়েছে। তাৎক্ষনিকভাবে অশোক বাবু ইজি চেয়ারে বসা ভঙ্গীমা বদলীয়ে সোজা হয়ে বসে পড়েন। আর বললেন- কি হয়েছে শুনি ! কি বললে? স্ত্রী সুমতি একটু থত মত খেলে পানের কোটা নিয়ে পানের খিলী বানাতে ব্যস্ত হয়ে যান। মা সুমতি আস্তে আস্তে ছেলে প্রকৃতির কথাগুলো একে একে বর্ণনা করেন। সব কথা শুনে বাবা রেগে বাক বাক হয়ে যায়! চুপ হয়ে মাথা ধরে রইলেন অশোক বাবু। কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন.....

কল্যাণীয় প্রকৃতি,
অতি সুন্দর ও কলেজ জীবন ছ'বছর শেষে আজ দীর্ঘদিন পর আমাকে লিখতে হচ্ছে এমন এক পরিস্থিতিতে যা অনভিপ্রেত ও অপ্রত্যাশিত বিষয় নিয়ে। বাবা মা'র স্নেহ ও আদর যত্নে লালিত হবার প্রতিটি সন্তানের ঐশ্বরিক দান ও অধিকার। শিশুকাল থেকে অসহায়ত্বর প্রতিকুল পরিবেশ থেকে রক্ষা করে মা বাবারা লালন পালন করে তীলে তীলে বড় করে তোলেন। প্রতিটি মা বাবাই চান তার সন্তান মানুষের মত মানুষ হবে। সমাজে একটা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে থাকবে। আমাদের ও স্বপ্ন ছিল তোমাকে নিয়ে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছ। সমাজে একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে। দেশের ও দশের সেবা করে বাবা মায়ের আশা পূরণ করবে; পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দতা এনে জ্ঞাতির মুখ উজ্জ্বল করবে। কেউ চায়না সন্তান বিপথে যাক নষ্ট হউক, ভুল পথে চলুক, ভুল পথে পা বাড়াক।

তুমি পরিবারের সবার বড় এবং একমাত্র পুত্র সন্তান। তোমাকে দেখে ভাল মন্দ শিখে নেবে তোমার অপর দু'ভাই বোন। তোমার উচিৎ তাদের শিক্ষা দেওয়ার। তারা যাতে সু-পথে চলে ও পরিচালিত হয় সেদিকে খেয়াল রাখার। আমাদের নীতি আদর্শ ছোট বেলা থেকেই শিখে এসেছো; নিয়ম নীতির ক্ষেত্রে আমি যে বড় কঠোর তাও দেখে আসছো। তোমার ভাল মন্দ আচরণের উপর আমাদের মন মেজাজ নির্ভর করবে। তুমি এমন কিছু করো না যাতে তোমার ভাই বোনদের পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়; গোটা পরিবারটা ধ্বংস হউক। তুমি যে মরিচিকার পেছনে ছুটছো একবারও কি অভাগা মা-বাবাদের কথা ভেবেছ? তুমি নীতিচ্যুত হলে আমাদের মানসিক অবস্থা যে কি হবে এক বারও ভেবে দেখেছ কি? মানব জীবনে ধাপে ধাপে এমন কতগুলো বয়স ও সময় এসে পড়ে যা অপ্রত্যাশিত ও অত্যাবশ্যকীয়। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এ কথা সত্য যে বাবা মায়ের স্নেহ, ভাই-বোনদের আদর, সঙ্গী-সাথী, বন্ধুবান্ধবের মেলা মেশা প্রতিজনের আবশ্যক। সঙ্গী-সাথী, বন্ধুবান্ধবের ভালো লাগা; ভালো লাগা থেকে অনেক সময় ভালোবাসায় রূপ নেয়। ভালোবাসা ঐশ্বরিক দান! এটা শতসিদ্ধ ব্যাপার। এটা সকলের জীবনে আসে, আসবে। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে এর জন্ম। যুগে যুগে মানব মানবীয় প্রেম এসেছে, আসবে। প্রতিটি বাবা-মা এর ব্যক্তিক্রম-নয়। প্রত্যেকের জীবনে আসে। এ সময়ের অভিজ্ঞতা নিয়েই তারা আজ বাবা মা। বাবা প্রকৃতি,

তোমার এ কথা ভুললে চলবে না যে ব্যক্তি জীবন বাদেও সামাজিক জীবন বলতে একটা জীবন আছে। কেবল ব্যক্তি জীবনই জীবন নয়; ব্যক্তি অসম্পূর্ণ জীবন। প্রতিটি সমাজে বৈবাহিক বন্ধনের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। সীমা ছেড়ে গেলে তা হবে সামাজিক রীতি বহির্ভূত; অসমাজিক তথা অবৈধ। তোমাদের কৃতিত্বে আমাদের বুক ভরে উঠত। আমাদের বন্ধুমহল অন্যদের কাছে আমাদের খুবই সুনাম করেন। সম্মানের চক্ষে দেখে। এমনকি অফিসের সুপিরিওর বসরাও তোমাদের কৃতিত্বের খোঁজ খবর নেন; তোমরা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছো জেনে খুশী হন; উৎসাহ দেন। আমাদের আলাদা মর্যাদা দেন; সম্মানের চক্ষে দেখেন। সমীহ করে কথা বলেন। তুমি যে সমস্যায় ফেলেছ তা যদি বাস্তবায়ন হয় তবে আমাদের মান সম্মান সকল জায়গায়, সকল আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ডুবাবে। হাসির খোরাক হবো তাদের। নতুবা লোক সাহিত্যের খোরাক হয়ে লায়লী মজনু, শিরিণ ফরহাদ হয়ে থাকতে হবে আগামী প্রজন্মের কাছে অথবা সারাজীবন ধরে পস্তাতে হবে। কেননা তারা সবাই জানে তোমরা অতি ভালো, ভদ্র, নম্র, শান্ত ও বুদ্ধিমান। এ সকল গুণের জন্যই তোমরা তিন ভাই বোন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছো দিনে দিনে এ ধারনা তাদের। আজ তোমরা অযথা অবাস্তব বিষয় নিয়ে তোমাদের দিনগুলো জীবনখাতা থেকে হারাচ্ছো দু'জনে। বাস্তব বাদী হও।

সুতরাং যেটা বাস্তব নয় সেটা নিয়ে তোমরা ভেবো না- এ আমার পরামর্শ ও উপদেশ। বাস্তব বাদী হতে কর্মমূখী হও! বন্ধু-বান্ধবী কার না থাকে। যাদের চিত্ত দুর্বল তারা চিত্তকে দমন করতে পারে না বলেই এমন বিপদগ্রস্থ হয়। কারণ কল্পনাপ্রসুন প্রেম আর বাস্তব এক জিনিষ নয়। প্রেম মানুষকে অনেক সময় কল্পনার ফানুসে ভাসায়; সীমাহীন গহীন অরন্যে নামিয়ে দেয়; বিপদগ্রস্থ করে সর্বশান্ত করে। প্রেম আর বাস্তব অনেক তফাৎ। মানব প্রেম ভাল; কিন্ত সব প্রেম ভাল নয়। প্রেম মানুষকে মোহে অভিভূত করে; অন্ধ করে ফেলে অনেক সময় সৎ জ্ঞানহীন করে, এমনকি ধ্বংস ও করে। বাস্তবতা বিষয়টার অর্থ ব্যাপক সীমাহীন এবং সারা জীবনের বিষয় দুটি মানুষের দাম্পত্য জীবন থেকে শুরু করে শেষ জীবনকালের ব্যাপার। এ দুইয়ের মধ্যে নদী আর মহাসমুদ্রের সঙ্গে তুলনীয়। সুদূর প্রসারী চিন্তা না করে কাউকে হুত করে জীবন সঙ্গী করা যায় না। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েই দাম্পত্যজীবন শুরু করলে জীবন শুভ হয়। তাছাড়া অসঙ্গতিপূর্ণ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক অনেক সময় নিজের জীবনকে বিষময় করে তোলে; তেমনি এর পরিণতি ও হয় অতি ভয়াবহ; তাদের প্রজন্মরা মানসিক ভাবে ভোগে, নিজেদের পরিচয় তুলে ধরতে পারে না।

বাবা প্রকৃতি, তুমি পরিবারের মান সম্মান, সুখ শান্তি বজায় রাখবে এ আমরা চাই। পড়াশেষে গরীব পরিবারের হাল ধরবে। আমাদের শেষ জীবনের সহায় সম্বল তুমিই। তাই আবারও বলছি তুমি নিজেকে গুটিয়ে নাও।

পরিশেষে উভয়ের প্রতি আমার পরম উপদেশ উভয়ে বাস্তব বাদী হও। বাস্তবকে স্বীকার করে নাও। অন্যান্য দশ বন্ধু বান্ধবীর মত পরস্পকে আচরন করতে শিখ। মনকে শান্তনা

দাও। আর জীবনের মূল্যবান সময় টুকুকে অপচয় করো না। সামনে শেষ সেমিষ্টার। ভালভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে পড়া শেষ কর। এ আমার ঐকান্তিক কামনা।

ইতি
তোমার বাবা
তাং- ১৩/০২/২০০২ খ্রিঃ

চিঠি শেষ করে বেড-সাইডে কাগজ কলম রেখে ইজি চেয়ারে গা হেলান দিয়ে দু হাত মাথায় রেখে আবার ভাবতে চেষ্টা করেন- এই কি বাস্তব! না কল্পনা! গভীর চিন্তার পর বের করলেন আসলেই বাস্তব। আগামী কাল ১৪ই ফেব্রুয়ারি। ভ্যালেন্টাইন্স ডের তাড়নায়ই ছেলেটা ঐ মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে। সাত পাঁচ অনেক ভাবলেন। কি করলে ভাল সিদ্ধান্ত হবে তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না অশোক বাবু। অবশেষে স্থির করলেন আগামী কাল খুব ভেবে চিঠিসহ স্ত্রীকে পাঠাবেন ঢাকায় ছেলের কাছে।

এর পর অনেক অনেক ঘটনার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয়েছিল অশোক বাবুদের। অনেক কাঠ-খড় ও পোড়াতে হয়েছিল সময়ের স্রোতের সাথে। আজ ২০০৬ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা। অশোক বাবুর চোখে ঘুম নেই। বিছানায় শুয়ে ছিলেন রাত ১১.০০ টায়। নিত্যদিনের অভ্যাস বসত সাহিত্য কলাম দেখতে গিয়ে হঠাৎ চোখ গেল ভ্যালেন্টাইন্স ডের একটা আর্টিক্যালের ওপর। চোখ বুলাতে থাকেন আর্টিক্যালটার লাইন লাইন ধরে। কিন্তু কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারছিলেন না গল্পটাতে। জীবনে নিজ ছেলের ঘটে যাওয়া ঘটনা তাঁকে বারে বারে তাড়নার স্মৃতিগুলো একে একে। মাঘের শীতে শত লেপ তোষকের আরামদায়ক বিছানাও তাঁর কাছে কাঁটার বিছানা; কেবল এ পাশ ওপাশ করা ছাড়া তার অন্য কোন গত্যন্তর নেই। বর্তমানে প্রকৃতি বি সি এস ক্যাডারভূক্ত ইঞ্জিনিয়ার। মর্যাদাপুর্ণ সরকারি চাকুরে। কিছুটা বিত্ত এসেছে তাদের পরিবার। অভাব তেমন নেই। কিন্তু শত আনন্দের মাঝেও প্রকৃতির একাকিত্ব জীবন দেখে পরিবারে সকলের কাছে কেমন যেন অভাব বোধ হয়। অশোক বাবু কে ভ্যালেন্টাইন্স ডে র ঘটিত ঘটনা বারে বারে আঘাত করছে। অতীত আজ তাঁর কাছে শুধু স্মৃতিবিজড়িত এক বুক জ্বালা।

পরিচিতি : লেখক ও সমাজ সেবক, কালিন্দীপুর, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি।

মুইঙ্যালই পূঙ্যা

বি.এন.তঞ্চঙ্গ্যা

রচঙ্যা-আদামর-পয়া-মুইঙ্যা-ভা-রী-ডে-ঙ্ .দিন্-নয়া-আদামত্-মা-ইন্শ্বর-ফল-গা-ইছ-ত-ফল-চু-রি-গুরি-খা-না-আর-ঝু-ব-ভূ-দ-রে-পা-ই-স-ছ-থ-য়ানা। তা-ত্তুন-ছি-য়ান-বাদে-কোন-কাম-নাই। আদামর-পয়া-পূঙ্যা-ইক-কুলত্-যা-য়। বিল্ল্যা-বিই-ন্ন্যা-লেয়া-পড়া-শি-য়ানা-তা-কাম। ইক্-কুল-ব-ন্ধ-পালে-আদম-স-মাজ্জ্যা-লই-মাদত্-খেলা-খেলি-থাই-পূঙ্যা-তা-দগে-তে-বেড়াই-আর-খেলে। মুইঙ্যা-দক্ক্যা-মাইনষ্যর-ফল-বাগানত-ন-যায়। পরর-জিনিত-ন-ধরে। পূঙ্যাততুন-বানা-ইককলত-যাবার-চিদা-আর-লেয়া-পড়া-শিইবার-চিদা। মূইঙ্যা-বেড়-ায়-বেড়ায়-দিন-পেলায়। পূঙ্যা-ইক্কুলত-দিন-নয়া-যাইদে-সময়ে-নকুলায়।

আদমর-সমাইজ্জ্যাউন-গাবুর-উললাক।কেয়-কে-য়-বউ-লুলাক।সঙ-সমাজ্জ্যা-মেলাইন-বউ-গেলাক। মুইঙ্যা-বেড়ায়দে-বেড়ায়দে-বউ-লবার-সময় -ন-পার'-ইদে-দি-নে-মদখান-সেমাজ্জ্যালই-মি-লিনে-মাই- নষ্যর-ক্ষতি-গরানা-ছাড়া-তার -দিনান-ন-যায়। -পূঙ্যা-বাবে-পুঙারে-শঅরত-গম-ইকক্কুলত-পড়াললই। পুঙ্যাই- ইককুল- বন্ধ- পালে-ঘরত-আয়ছে।-ঘরত-আলে-আদমর-সমাজ্জ্যালই-খেলে-সমাজ্জ্যাউন-তারে-গম-পান-। তারে-ভাত-খা-বার-নিমন্ত্রন-ঘরন। ইককুল- বন্দ- ফুরালে- শঅরত- ইককুলত-যাবার-লক-কে- আদামতদ-বুড়াবুড়ি-মুরববী-উ-নরে- ঠেঙ- ধুরি- আ-শির্বাদ- লয়-পূঙ্যা- লেয়া- পড়া- শেদ -গুরিনে- পুলিশর- দাঁয়র- কর্মকর্তা- চাউরি- পাল। পুলিশদ-চাউরি-লইনে-তারার-আদামর-থানাত-বদলী-উল। থানা-যোগদান- গুরিনে-আদামত-আল-বুড়া-বুড়ি-মুরব্বী- নরে-ঠেঙ-ধুরি-আশির্বাদ-লু-ল। মুররবী উন লই আদামর শান্তি শৃঙখলা আলাপ আলোচনা- গুরিলাক।-মুরব্বী-উন-পূঙ্যারে-লইনে-খু-শি-উলাক- গর্বে- তারার- বুগ -কআ- ভূরিল। কই- উদিলাক- আমা- আদামত- শান্তি-উ -ব- উন্নতি-উব-আলো-জুলিব। পূঙ্যারে-মুরববীউন-আশির্বাদ-দিইনে-বিদায়-দিলাক।

প-দত-মুইঙ্যালই-দেয়া-উল।পূঙ্যারে-দিইনে-মুইঙ্যা-তারে-ন-চিনের। চিদা-গরের-ইবা -কি-পুলিত-তে-কি-আদামত-মরের-ছিদে।মনে-মনে-মুইঙ্যা-দরার-গাল-দের-লুয়ারে-অসুবিধাদ- পুরিন। যায়-চাঙ। পূঙ্যা-মুসুনত-আয়-নে-পূঙ্যারে-সালাম-দেয়।

"নমইতকার-স্যার"-পূঙ্যা-তারে-কই-উদিল-তুই-মুইঙ্যা-ন-ইনে? মুইঙ্যা-কই-উদিল-"অয়-অয়-স্যার" -ম-নাঙ-মুইঙ্যা। পূঙ্যা-কই-উ-দি-ল। মরে-তুই-ন-চিনর? মুইঙ্যা-লারে- গুরি- কুল- ও- ও:-তুই-পূঙ্যা-নইনে?

"উ:সালে-চিনিলে-মুইঙ্যা-কই-উদিল-তুই-দ-পুলিশর-দাঁয়র-কর্তা- উলেছি। মুই-দ-মইঙ্যাদে - মুইঙ্যা-র-ই-য়-ন-ভাই। মুই-তরে-সালাম-জানাঙ-তুই-বড়-মা-ন-ই-ত-উলে-। আমা-আদামত-তুই-শান্তি-উন্নতি-বাত্তি-পহর-গুরিদি-পারিবে-পূঙ্যা-কই-উদিল-আদামদ-চোর-ডা-ইত-আলে-থানাত-খবর-দি-পারিবে-মুই-পুলিত-দি-ধুরি-নিবার- ব্যবস্থা -গুরি-দিন-দে। মুই-ঙ্যালই-কদা-কইনে-পূঙ্যা-তা-গাড়ীত-উদিনে-গেল-গই।

মুইঙ্যা-আদমত-আয়নে।পূঙ্যা-কদা-কই-কই-বেড়ার-সমসাইজ্জ্যা-উ-নরে-জা-নার-। 'আমা-পূঙ্যা-পুলিশ-দাঁয়র- কর্মকর্তা-উয়ে-আমাত্তুন-আর-কোন-চিদা-নাই। আমা-কাম-আমি -গুইত্তে-কোন- দর- নাই। পূঙ্যা- আমানরে- রক্ষা- গুরিব- আমা-ন-রে- বাঁচাব। মুইঙ্যা- তা-সমজ্জ্যা-ফক্ক্যা, ধবঙ্যালই-তিন-জন-শল্লা-গুইল্ল্যাক। তারা- আদমত্তুন-দূরত-ভিন-আদাম, -কিলাছড়ি- আদমত- চুর- গুরিবাক। ঘরর-দিউলা- কাবিনে- শিং- দিবাক-কিলাছড়ি- আদামর চেবেদা মাজইন্যা ঘরত শিং দিবাক। তিন-জনে-মিলিনে- দিন-ঠিগ-গুরিলাক। শনিবার- বাচারর- দিন। তিন-জনে-বাচারত-যা-বাক। মাজইন্যা-দাই-আদ-ামত-ফক্ক্যা।বইনর-ঘরান। তারা-ঘরত্তুন-রাইদত-শিং-দিবাক। মাইজন্যা- ঘরর-পিছে-দি-ফক্ক্যা-বইনর-ঘর। তারা- ঘরত্তুন- মাজইন্ন্যা- ঘরান- বেয়াক- দেয়া- যায়। পূরানা-দি-নর-ঘর- পানিয়ে -ধয় -যাইদে -যাইদে -দিয়ালী -উচল-অইয়ে। -দিয়ালীয়ান-কুড়ি-লে-ঘরত- শিং- দি-পারিব। ফক্ক্যা-বইন-ঘরত-বইনে-ঠিগ-গুরিলাক-রাইদত-মানইত-ঘু-মে-ঈং-ছিঙ-ঔলে-তারা-কাম-গুরিবাক-দিয়ালীয়ান-কুরিদে-খন্ডা-দরকার।ফক্ক্যা-খন্ডা-থয় াই-তুল- বেলান- থাককে -তিন -জনে -মাজইন্যা -ঘরর -চার -হাত্যি -বেড়াই-চা-লাক। কুন্দি-শিং- দিলে-গম-উব। ঘরর-পিচ্ছেদি-মাজইন্যা-ঘুম-যাদে-খাদর-উছু-উছু-শিং-দিবার-ঠিগ-উল-রা-ই-দ-উ-ল।-ফক্ক্যা-বনইসহ- মুইঙ্যাদাই- বেয়াক্কুনে- রাইদত-সম-ারে- ভাত-খালাক। -খায়-দাই-খাদক্ষন-বইনে-গপ-দিলাক। গপ- ছারিনে- ফক্ক্যা -বনই -তা-রানে-ঘুম-যাবার-দিশা-গুরি-দি'নে-তে-ঘুমত-পুইজ্যে-গই-। ফক্ক্যাদাই- ঘুমত -পুলাক। রাইদের- অর্ধেয়ত- মুইঙ্যা- ফক্ক্যারেলই- ধবঙ্যারে- হাদর-. ঈশারাদি- ডাই-তু-লিল, তিন- জনে- ঘুমত্তুন-উদিনে শিং-দিবা-তিয়ার-উলাক। মুইঙ্যা ফক্ক্যারে কানে কানে কুল-পেলা-দ এককয়া -লাইব।ফক্ক্যা পেলা আনিল। তিনজনে শিং দিবার প্রস্তুত উলাক। তিনজনে ঘরত্তুন বারেন্দি- আলাক- মুইঙ্যা- ফক্কারে- খন্ডান- দিল। দিয়াল-ীয়ান-ফক্কা-কুড়িল। কুড়া-শেদ- অইলে- ধবঙ্যারে- পেলাবা- খন্ডা- মাদাত- দি- ইনে-পরীক্ষা- গড়া- দিল। ধবঙ্যা-পরীক্ষা- গুরিল। বেয়াক-ঠিগ-আহে। মুইঙ্যা- ধবঙারে-ঈশারা-দিইনে-দ্বিজনে-ঘরত-স-মা-লাক্কই। ফক্ক্যা- বারেন্দি- চুয়িদি- আহে।মুইঙ্যা-জিনিত- পাতি- গামছাদি -বা-নি-ল। ধবঙ্যা- পিদল- খ্যাঁ- এককয়া- হামদততুন- ঝড়াই-ফেলাইনে- মা-জইন্যা -মুখ- কয়াততুন- ঘুম- ভাঁইল। রাইদ-অর্ধেয়ত-চেরাগ-বাত্তি-ধরাইনে- দেয়েত্বে- দ্বিজন-মা -নইত- গামছা- মছা- বাইন্যা- গুরি-টিয়াই-আহন। মাজইন্যা- মুখ- ক-য়া- মাজইন্যারে- ডাই- তুলিল। মাজইন্যা- চুর-চুর- কই- ইউর-গরের। আদাম- মানইত- মাজইন্যা- ইউর- শনিনে- আলাক। ফক্ক্যা- মা-ইত-পা-ইনে-তা- বনই- ঘরত- ঘুমত- পুরি- আহে-গই। ইন্দি- মুইঙ্যারে-লই- ধবঙ্যারে-দু

রিদি- বানিল্যাক। ফক্ক্যা- তারানে- দিইনে- চিদা-গরের। কি-জানি -কি-অয়। বিইন্যা-পহর-উল। আদামর- কারবাইজ্জ্যারে- ডায়িলাক। কার্বাইজ্জ্যা' -মুইঙ্যারে- দিইনে-কই- উদিল-তুই-মুইঙ্যা-নইনে? মুইঙ্যা-কই-উদিল।

"অয়-জিদু-মুই-মুইঙ্যা"। কার্বাইজ্জ্যা-তারে-পুসার-গরের-"আঃ কি-গরা-আলেদে- মুইঙ্যা?" -মুইঙ্যা- কই-উদিল - "আমি -বেড়া- আইচ্ছিয়ে- জিদু"- কার্বাইজ্জ্যা- পুসার- গরের- বেড়া- আইনে- কি-বা-নান- খালেদে- মুইঙ্যা- কই-উদিল। বেড়া- আইচ্ছি- নি-জিদু- ধবঙ্যা- কয়দে- মাজইন্যা- ঘরান-শিং-দিই-শিং-দি-ইরে-ধরা-পুলঙ-কারব- াইজ্জ্যা-ধবঙ্যারে-পুসার-গুরিল। "অয়নে- ধবঙ্যা- তুই- মাজইন্যা- ঘরান- শিং- দিবাল্লাই- কুইয়ত্তে- অয়দে-নে?" ধবঙ্যা-কুল

মুই-ন-কঙ-মামু-মুইঙ্যা-মরেলই-ফক্ক্যারে-সমারে-আইন্নেদে-মাইজইন্যা-ঘরান-শিং- দিবাল্লাই-কার্বাজ্জ্যা-ফক্ক্যারে-তয়ার। ফক্ক্যা- কুধি-ফক্ক্যারে-ডায়ি-আন। কারবাইজ্জ্যাই- ফক্ক্যারেডায়ি- আনি-বার-মা-নইত-পাদল। ফক্ক্যারে-ডায়ি-আনিলাক। কার্বাইজ্যা-ফক্ক্য- াতত্তুন-পুসার-গরের

অয়নে-ফক্ক্যা-মুইঙ্যা-বেলে-ঘরত-শিং-দিবাল্লাই-তমারে-আইননেরে-ফক্ক্যা-কুল অয়-মামু। কার্বাজ্জ্যা-ঘটনার-ঠিগ-পাইনে-আদামর-মাইনষ্যলই-শল্ল্যা-ঘরের-তারা-নেদ- থানাত-দেয়ন-ছাড়া-উপায়-নাই। থানাত- নিবাল্লাহ- তিয়ার- উইদে- উইদে- থানা- পুলিত- আদামত- আলাক। পুলিশশুন- কার্বাইজ্জ্যালই- কদা- কুলাক। কার্বাজ্যালই- আদামত- মানী- গন্য- মাইনষ্যর- টিপসই-লুলাক। দ্বিবা-পুলিশে-হ্যান্ডকাপদি-বানিলাক। থানাত- যাইদে- মুইঙ্যার-আদামর-ছেড়েদি-যা-পরে। -মুই-মুইঙ্যাদাই-তিন-জনে-হ্য- ান্ডকাপদি-বাইন্যা-দিইনে-আদামর-মাইনষ্যে-কুইদন। গিরিত্তর- দইত- দিন- চোরর- একদিন- গুইত্তে-গুইত্ত্বে-পাপ-পূরায়েদে-ধরা-পুলাক। পাপ-বাবরে-ন-ছাড়ে।

থানা-হাজদত-তিন-জনরে-ভরালাক-পুলিশ্য-হাজদতান-তালা-মারি-দিল।আস- ামী-আইন্যা- দারগ- কেয়া- ফাইললয়া- পূঙ্যা- টেবিলত- থুইয়ে। পূঙ্যা- ফাইল- লয়া- দিইলে-খুলি-চাল-আসামী-না-মানি-মুইঙ্যা,ধবঙ্যা,ফক্ক্যা,তিন- জনর- নাম- দিইনে -চেয়ারত- হেলান- দিনে-ভাবের-তারানে-গেয়া-দেয়া-ন-দিন। এক-রাইত-দ্বি-দিন- হাসদত-থাই-দোক। আমদত- মুরবীউনরে- খবরান-দিন- তারা- আলে-ম- অফিসত- আনা-দিন। পুঙ্যা- মুইঙ্যাদাই- আমাদত্তুন। মুরবব্বী-উন- খবর-দিল। মুরববীউন-পূঙ্যা- অফিসত- আলাক- পূঙ্যা- মুরববীউনরে- শ্রদ্ধা- সম্মান-দিল। পুলিশ- দায়িনে- মুরব্বী- উনেরে-চা-নাস্তা-দিবার-কুল-পূঙ্যোরে- তাপুলি- শশুনে-স্যার-স্যার- গুরি- সালাম-দিদন- আদামত- মুরব্বী-উনে-কুইদন-পূঙ্যা-কদক-সম্মানীয়-মানইত।কদক-সম্মান- পার। চা- নাস্তা -খাইদে-খাইদেপুঙ্যা-কুল-মুইঙ্যা-ধবঙ্যা-ফক্ক্যারে-পুলিশে-ধরিলে- থানা-হাজদত- থুইয়ন-দে-তুমি-মাইত-পনি-মুরব্বীউনে-কই-উদিলাক-অয়-অয়-মাইত-পে।

পূঙ্যা- কই-উদিল- আইন- মতে-তা- রানরে- কোদত- চালান-দেয়া-পরে-তুমি যদি-তারা -নরে-জামিনে-নি:পারদে-অয়-তমা- নরে- দিই- পারিন। কে-য়-জামিন-উলে-তা- রানে-বা- নিনে- কোর্দিত-চালান-দেয়া-পুরিব।

মুইঙ্যাদাইনে-দ্বিদিন-একবাইত-থানা-হাজদত-বানি-থুলাক-মুইঙ্যা-ফক্ক্যা-ধবঙ্যা- বুচিল-াক-থানা-হাজদত-কি-দুগ-তিন-জনে-শল্লা-গুইল্লাক-ভাইলক-ঈকাম-আর-জীবনে-জীবনে-ন-গুরিবঙ। ঈ-মুইঙ্যাল্ল্যাই- আমার- যত-দুগ -ভূগা- পরেত্ত্বে-ফক্ক্যা-কোই-উদিল। খায়-ন-পালেয়- মুই-আর- ঈকাম-নগুরিন। ধবঙ্যায়- কোই-উদিল-হা-দে-ধু-রি-দূগ- পা-না-মুই-কোন-দিন-আর-ঈ-কাম-ন-গুরিন।

পূঙ্যা- অফিসত- আসামী- মুইঙ্যা, ধবঙ্যা, ফক্ক্যারে- আনিলাক। অফিসত-আদামত-মু-রব্বীউন-দিইনে-তারা-লাইসে-থ-দরঙ্যা-উলাক।আদামত-মুরব্বী-জয়-ধনে-কই-উদিল। মুইঙ্যালই-পূঙ্যা-বাবু-চিয়নত্তুন-ধুরি-এক-আদামত-এক-সমারে-দাঁয়র-উলাক। আইচ্যা-াপূঙ্যা-বাবু-লেয়া-পাড়া-গুরিনে-থানাত-দাঁয়র-কর্মকর্তা-উয়েছি।আমা-আদামত-গর্ব-অহংকার- গুরি-পারি। মুঙ্যা- লেয়া-পড়া- মন- ন-দিনে- তার- কি-দশা- তল্লাই-দ-আমা-আদামর- মুয়ান- পুড়ি- গিয়ে। পূঙ্যা-বাবু- দগকেয়া- গুরি-লেয়াপড়া-শিইদে- তুইয়- অফিসার-কর্তা- উইদে। বু-ছি-ছাঁ-মুইঙ্যা- গম-পদে-হা-দিলে-গম -জা-গা-পাই। অপদে-হাদিলে -অজাগা -পায়- মাইনষ্যত্তুন- লাদি-খায়-পায়।সৎকর্মে-স্বর্গ-বাস, অসৎ- কর্মের- সর্বনাশ। মুইঙ্যা- মা-দা-বা- তলেদি- গুরিনে- শুনি- রইয়ে। পুঙ্যা-তা-রা- নরে-জামিন- দি-ল-মু-রববী- উন-খুশী-অইনে- পূঙ্যারে-আশির্বাদ-দি-দন।

সমাপ্ত

পরিচিতি: সমাজ সেবক, কাঁঠালতলী, কাপ্তাই।

কাব্য নাটক

কুন্ডলী বালার অর্হত

মৃত্তিকা চাকমা

দৃশ্য – ১

ইহ্‌ধর কধায় ঃ বারানসী নগরর রাজগৃহ নাঙে এক্কান জাগাত উক্ক মাহ্‌জনর ঝি যক্কে ষুল' বঝর পুরেল' সক্কে মা বাবর চিন্তে গভীন ওই উধিল'।

মাহ্‌জন্যার ঝি দাঙর ওই উধের
চিন্তে বারী যার কিঙিরি তারে
অ' পধে অ' ঘাদে ন' আহ্‌ধে যেন;
মা বাবে ব' নিজেস্‌ ইরি দি খয় মারার
কি যত্নে কি গোরিব', বয়স পার ওই
চিন্তে কুল দুর অভ'? মা-বাবে–
মিলে চাগর ডাগিলেক , নিধুক টুক ষুল' বঝর
গম ভাঞ্জ্যেই ইহ্‌ধত্‌ ন' উধে
ইখেন লুগি যেই চিত্তেন ফুরমারে
সাততালা গুধিত যত্নে রাগেবা
গাভুর মরদ ঝিও চোগোত যেন ন' পরে।

দৃশ্য - ২

ইহ্‌ধর কধায় ঃ বারানসী রেজ্যেত চুরী চামারী ন'অহ্‌ধ, ঘন্দ চক্র কন' দিন কন' কালেই ন' এল' । এক দিন উক্ক গাবুর মরদ চুর গত্ত যেই ধরা পরে।

রাজা - কুধু গেলা পুলিশ দারুগা?
এই মরত্তর শাস্তি মৃত্যুদন্ড
আহ্‌ধ বারায় প্রজা সম্পুত্তি ধরা পরে
তার শাস্তি মৃত্যু দন্ড; তার বাজি থেবার
জাগা নেই ; তারে ইত্তুন পিদি পিদি
তারেঙ মাধাত্তুন আঙর কুলর , আঙরুনর খানা দুও ।
রাগে টাগে ডাগি কয়
কুধু গেলা পুলিশ দারুগা , ঝাদি এই নেয' গোই ।

দৃশ্য - ৩

ইহ্‌ধর কধায় ঃ গাবুজ্যা চুর মরত্তরে রাজার পুলিশ দারুগাউনরে পিদি পিদি নেযাদে শলাত সাততালা বিল্ডিং উগুরেত্তুন মাহ্‌জন্যা ঝি-ব' চুর মরত্তরে দেঘী আধা মুজ্যা যায়।

মাহ্‌জন্যা ঝি- ভাত পানি ইরি দিম
আভুহদা উভোজ থেই মরি যেম
নেয' গোই ভাত থাল , তোন কদরা
চাগরী আমক অয়; কী অহ্‌ল'-
নাগরী - ভাত খা , শুনিলে অভ' দিদদেরী
মাহ্‌জন্যা ঝি ন' খেম মুই ভাত , মরি যেম
কই দ' গোই
পিদি পিদি নেযাদন পুলিশ দারুগায়
নেক ইহ্‌ঝেবে গোঝি লোম সিবেরে ।
চাগরী - মাহ্‌জন মাহ্‌জনী নানু
মিলে পুও নাগরী অসুঞ্জক ওই আঘে
নেক লব' রাজার শাস্তি পেইয়্যা চুর
নেযাদন ধরি তারে ন' পেলে জীবন দিম
ফেলেই দিম সাততালাত্তুন জনমে ।
মাহ্‌জন্যা - চুর' বংশ কিঙিরি অভ'
মা নাগরী জাত যেব' সিয়েন তুই ,
গোরিবে কিঙিরি ? না - না -না
মাহ্‌জন্যা ঝি তারে ন' পেলে মরিম্মই
নাদ দি। কই দেগোই
মাহ্‌জন্যা মনর দুগে কই দে , দারুগা সাপ
এক আহ্‌ঝার তেঙা দিলুং তমারে
ফেলেই য' তারে , ম' জামেই ইহ্‌ঝেবে।

ইহ্‌ধর কধায় ঃ পুলিশ দারুগাউনে মাহ্‌জন্যা কধায় আ তেঙার লুভে চরব'রে মাহ্‌জন্যারে ফেলেই দি অন্য উক্ক মানুষ মারেই ফেলেই রাজারে বুজ দিলেক্কই । তারপর মাহ্‌জন্যা ঝি'বলোই চুরব' মেলা অয়।

বৌ সাঝিল' মাহ্‌জন্যা ঝি নাগরী
সনা রুবয় পিনন খাদিয়ে
জলং জলং ওই আঘে নাগরী
নুও বৌ সাঝিনে ঢুলে দগরে জদন ঘর,
ফুলে পাগোরে ভরী যায়
রাজগৃহর বাম হালর চাগালায়।

দৃশ্য - ৪

ইহ্‌ধর কধায় ঃ লম্পদ, চরিত্রহীন , জামেই অহ্‌নার পর মাহ্‌জন্যা ঝি নাগরিত্তুন স্বয় সাগর সনা রুপ' তেঙা পয়সা অস্ত অলংকারর লুভ সামালেই ন' পারি কু বুদ্ধি তুলে

চুরয়্যা -কিয়ে পেল' মোক থোক -
কিয়ে পেল' তেঙা পয়স্যা সনা রূপ পেলে মুই
মোক মারি ফেলেই যেম শল ধরি
দানা পানি মুওত ন' দি পরি থায় বিচ্ছোনত ।
মাহ্‌জন্যা ঝি- কি ওইয়্যা কি ওইয়্যা !
জ্বর জারি এলে ক' বাবা মামা কি কোয়ন
ভাঙি ক; মুই আঘং ত' লগে ।
কিচ্ছু নয়, কিচ্ছু নয়
বানা এক্কান বানিহ্‌ আঘে মনানত
চুরয়্যা শল ধরি কোই উধে
রাজার পুলিজে সক্কে নেযাদন
মানস গোস্যং তারেঙ দেবেদারে পূজ' দিম ভক্তিয়ে
তারেং দেবেদায় বাজেই,তর মর জদন অয়
ইহ্‌ধত ফিরি পেয়ং জীবনান।
মাহ্‌জন্যা ঝি- চিদে কিয়ে গরস
ইক্কু মুই উভেই দোঙর কি লাগিব' কোই দে,
চুরয়্যা - পূজত্যায় মধু , মিশ্‌টান্ন খই আর
চেরবাবদর ফুল। পুজি এম্বোই তারেং দেবেদার কুল

দৃশ্য - ৫

ইহ্‌ধর কধায় ঃ মাহ্‌জন্যা ঝি , নেক্কর মন' দুগ কাদেই দিবেত্যায় বেক্কানি যুগল।

চুরয়্যা - পিনন খাদি , সনা রুপ অস্ত অলংকার
এক মনে পুজ' দিবং দ্বিজনে
ন' লাগিব' চাগর চাগরী কাররে
দ্বিজনে বানা দ্বিজনে; খুঝী অয় নাগরী।
মাহ্‌জন্যা ঝি সাঝি গুঝি আহ্‌ধদন
চুর জামের পুজ' দিবের ধারাজে
মুরো উত্তন তারেং বাদন বানা দ্বিজনে ।

ইহ্ধর কধায় ঃ তানজাং তারেং । বারানসী নগরর কন' জনে দুষ কাবেলে রাজা মৃত্যুদন্ড দি দ' সিত্তুন ফেলেই । পরিলে রক্কে নেই । সেনত্যায় সিয়েনর নাঙ মরন তানজাং তারেং বঝি যায় ।

চুরয়্যা পুজ' দিবের নয় আঝলান
সনা রূপ' অস্ত অলংকার কারিলোই
তারেঙত্তুন ফেলেই দিম , মরিবে তুই
কি শুনেলে মর পরান ?
সনা রূপ, অস্ত অলংকার বেক খুলি দিম
মরে তুই প্রান ভিক্ষে দে। না না না
ঘরত যেই মা বাবরে কোই দিব
রাজা সিধু নালিশ দিবে
পুলিশ দারুগায় মরে নি
তানজাং তারেং মাধাত্তুন ফেলেই দিম।
মদ খেম ফুর্তি গোরিম চুর ডাগেত ধেং বাজি গোরি যেম
হা---- হা----- হা----- হা-----
কন' জনরে থান পেবার ন' দিম।

দৃশ্য - ৬

ইহ্ধর কধায় ঃ চুর নেক্কর কধা শুনি নাগরীর মুর গুজুরী কানি উধে । আগভিলেশ খায় সামান্য সনাত্যায় ম' জীবন নাজ গোরি দি দ' চর ! হাক্কন পর মেয়্যো দোয়্যা , সনা রুপ' বেগ ফেলেই দি পরানা বাজেবার ভাবনাত থায়

মাহ্জন্যা ঝি- তুই মর নেক দেবগনর সং -
মরনর আগেও তরে মুই পুজ' গত্তুং চাং
তারেং , মাধাত থিয়ে তুই
থুম সং শ্রদ্ধা গোরি লং
নেগে মোগে এচ্যা আওচ্ছান পুরেবং ।

ইহ্ধর কধায় ঃ চুরয়্যা তারেং মাধাত্ থিয়েল' । মাহ্জন্যা ঝি তিন খেপ পাখ খেই চুরয়্যারে আজা বেরেই আল্যাঙ গোরি থেঙত ধরি সালাঙ জানেই কল' তলোই মর ইয়ান থুম দেঘা। আর' এক খেপ ঘুর পাখ খাদেই চুরয়্যারে এক থেলায় তারেং' মাধাত্তুন ফেলেই দে। চুরয়্যা এ পাত্তরত্তুন ও পাত্তরত আভর খেই গুত্যা মগজ নিঘিলি দোয্যাত পরে যায়।

পর্বত দেবেদা সাধু সাধু সাধু
মরদ পন্ডিত মরদ বলী বেক্কানিত নয়
মিলেয়ও পারন মর'দরে
ন' লাগিব' অলংকার ন' লাগিব' তেঙা পয়সা
এই জীংকানী ফেলেই দিম
ঝারে জঙলে সত্য পদ তোগেই যেম।

দৃশ্য - ৭

ইহ্ধর কধায় ঃ মাহ্জন্যা ঝি নাগরী , তার পিন্যা অস্ত অলংকার বেগ তারেং' মাধাদি লুগি মারি গভীন ঝারত সোমেই যায়। কুল অইয়োই এক ধ্যানী ভান্তের আশ্রম সাধনাত । সিধুই প্রব্রজ্যা লোই খুব দু:খ কষ্ট সহ্য গোরি সত্য পদত তোগাত তে লামি যায়। একদিন তে সে সত্যপদ সুখ পেই

ধ্যানী ভন্তে - বালা , তর ধ্যান তপস্যা থুম অল'
গোদা জম্বুদ্বীপ ভঙি চা সত্য পদ পুঝর ল'
জাম গাঝর ঢেলা ধরি সত্য পদে আহ্ধি যা।
দায়ক সত্য পদর জোপ পাস , সালেন তারে তুই নেক বানেই পারিবে।
আর যুদি ধ্যানী ভিক্ষু জ্ঞান তুই মাগিবে।

দৃশ্য - ৮

ইহ্ধর কধায় ঃ মাহ্জন্যা ঝি নাগরী সে জাম গাঝর ঢেলাব' ধোরি আদামর পর আদাম, চাগালার পর চাগালা বুদ্ধর বানী প্রচার গরানাই তার নাঙ ওই যায় গোদা জম্বুদ্বীপ। সিত্তুন ধোরি তার নাঙ ওই যায় জম্বু দ্বীবর ভিক্ষুনী। গোদা জম্বুদ্বীপ ভঙিনেও সত্যর জোপ ন' পেল'।

জম্বুদ্বীপ ভিক্ষুনী জাম গাঝর ঢেলা
ধুল্যা কুরত কুবি ভিক্ষেত যায় শ্রাবস্তী নগর
সারিপুত্র স্থবির ফিরি এযে ভিক্ষেত্তুন
দেঘে তে, এক ঝাক গুর' লক খারা খদন ঢেলালোই
পুঝর গোরি জানি পাল্যা সিভে কার
গুর' উনরে কল'তে, উগুরেই পেল' সিভেরে
গুরুউনে উগুরেই জোলবদন
ভিক্ষুনী এ্যাই কয় কন্না উগু বেল' ঢেলাব' ?
সারিপুত্র স্থবির কোই উধে , ও! ভিক্ষুনী , মুই উগুরেয়ং!

ইহ্ধর কধায় ঃ জম্বুদ্বীপর ভিক্ষুনী লোই সারিপুত্র স্থবির হেমা ক্ষেমী ন' অহনায় ধর্ম সভাত তর্কযুদ্ধ ডাগা অয়। জম্বুদ্বীপর ভিক্ষুনী এক্কান সারিপুত্ররে ধর্মকধা পুঝর গোল্যা। সারিপুত্র বেক্কানি জোপ দেনার পর তারে কল তুই দ' মরে ভালক্কানি পুঝর গোল্যা এবার তরে মুই বানা এক্কান কধা পুঝর গরঙ

সারিপুত্র স্থবির এক নাঙ কি?
ইয়েনর জোপ কি ওই পারে
ভাবী চাই জম্বুদ্বীপর ভিক্ষুনী
কন' জোপ নেই তার বিনয় সুরে পুঝর গরে
ভন্তে সিয়েনর জোপ কি ওই পারে,
মরে তুই ভাঙি দে । সুন সালেন মধনে
জ্ঞ্যান' অল' এই জোপ জানিবে ।
ভন্তে বন্দনা গরং মরে তুই এই জ্যান দে।

দৃশ্য - ৯

ইহ্ধর কধায় ঃ সারিপুত্র জম্বুদ্বীপর ভিক্ষুনীরে দীক্ষা দেনার পর ভিক্ষুনীরে তারার সেই ভিক্ষুনীর বিহারত পাধেই দে। সিধু থেই ধ্যান সাধনা গত্তে গত্তে একদিন তে অর্হত লাভ গরে । সক্কেত্তুন ধোরি তার নাঙ অয় কুন্ডল বালা থেরী। তারপর জোল বোদী যায় এই ভিক্ষুনী এধক ঝাদি, কিঙিরি অর্হত ওই পারে । বুদ্ধ তারা কধা শুনি কয়

ও ; ভন্তে দাঘী !
বুদ্ধ ধর্ম ঝাদি আর দেড়ী নয় ,
কর্মই অল' সত্য ।
আগা মাধা নেই কধা যেন আমল নেই
ধর্ম সারে উক্ক গাথা কধালোই পরম শান্তি পায়
আমল সারা আহঝার গাথা কনাত্তুন
তৃঞ্চা মিলেই ফেলানা
উক্ক গাথালোই পূন্য ফল অসাগর পা যায়।

৩০.০৯.২০১১খ্রি:

সুবর্ণ শ্যাম

(জাতক থেকে নাটিকা)

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

১ম দৃশ্য

সময় : দিন

স্থান: কালজয়ের বাড়ি

কাল জয় ও সুমন্তের প্রবেশ :-

কালজয় : (সু-মন্ত্রকে লক্ষ্য করে) বন্ধু সুমন্ত, আমরা মৃগন্মতা নদীর উত্তর ও দক্ষিন পাড়ের দুই গ্রামের দুই জন বন্ধু হলাম। আমরা কি পারিনা আমাদের বন্ধুত্বকে আরো সুদৃঢ় করতে?

সুমন্ত : অবশ্যই পারি বন্ধু উভয় গ্রামের লোকজন সকলেই নিষাদ, আর আমরা তাদের সকলের দলপতি আমরা যদি সুদৃঢ় বন্ধুত্বে আবদ্ধ হই, তাহলে দুই পারে প্রায় হাজার পরিবার নিষাদের ঐক্য হবে। তাহলে বলো বন্ধু তোমার চিন্তার বিষয়?

কালজয় : নিম্ন শ্রেণীর পশুকুলের আদর যেমন হেলন- পোষন। মানুষের মধ্যেও আদর স্নেহ ও ঘনিষ্ট তা ঠিক পারস্পরিক উঠা বসা। এখন আত্মীয়তা সক্রিয় হলেই উঠা বসা ও সক্রিয় হবে।

সুমন্ত : এবার একটু খোলাসা করে বলুন, সক্রিয় আত্মীয়তা বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছেন?

কালজয় : হ-বলতে চাচ্ছি, দু'জনে বন্ধু থেকে বেয়াই হওয়া। একজনের ছেলে হলে এবং অন্যজনের মেয়ে হলে তাদের মধ্যে বিয়ে করিয়ে দেওয়া।

সুমন্ত : এ আপনার অত্যন্ত ভাল প্রস্তাব। ঠিক আছে আপনার এ প্রস্তাব আমি সর্বা ন্তকরণে সমর্থন ও গ্রহণ করলাম।

প্রস্থান

দৃশ্য ০২

সময় : দিন

স্থান: খেয়াপারাপারে নৌকা

বিনতী : কোথায় যাইবা বোন?

শংখমালা : ওপারে আমার মামার বাড়ীতে যাবো।

বিনতী : কে তোমার মামী?

শংখমালা : কালজয়ের স্ত্রী বিন্দুমতিই আমার মামী। গতকাল মামীর নাকি এক পুত্র সন্তান জন্ম হয়েছে দেখতে যাচ্ছি।

বিনতী : ওহো চাইতো। ধাত্রী হিসেবে আমিই ছিলাম সেখানে।

শংখমালা : তাই নাকী? আচ্ছা-মা ছেলে কেমন আছে ?

বিনতী : ভালো আছে। মা ছেলে উভয়েই সুস্থ আছে। আমি আজ আবার এপারের সুমন্তদের বাড়ী থেকে আইতেছি। তাঁর বউ খেমানীকার ও একটি মেয়ে সন্তান হয়েছে। মেয়েটার চেহারা খুব সুন্দর। ভগবান তারে ভালো রাখুন।

শংখমালা : (ঘাটপারে এসে) এই যে, মাঝি ভাই? ভাড়া লও।

তিন্দুক : পাঁচ টাকার নোট থেকে (২ দুই) টাকা গ্রহণ করে তিন টাকা ফেরত দেয়।

বিনতী : (উনি দেন- মাত্র দুই টাকা)- লও।

তিন্দুক : (মাঝি) নিয়ে নিল।

প্রস্থান

দৃশ্য ০৩

সময় : দিন

স্থান: কাল জয়ের বাড়ি।

কালজয়, স্ত্রী বিন্দু মতি ও পুত্র দৃকুলকের প্রবেশ

কালজয় : (পুত্রকে উদ্দেশ্য করে) ব্যাস তোমার তো বয়স এবার ষোলতে পূর্ণ হলো।

বিন্দুমতি : অর্থাৎ আমরা তোমার জন্য বউ হিসেবে একটি সুন্দর কন্যা ঠিককরেছি।

দৃকুলক : (মা বাবার কথা শোনে কানে আঙুল দিয়ে বলে) আমাকে এমন কথা বলবেন না। গৃহবাসে আমার প্রয়োজন নেই। (দৃকুলক জানতে পারে উত্তর পারের নিষাদ দলপতি সুমন্তের মেয়ে পারিজাকে তার মা বাবা বউ হিসেবে ঠিক করেছেন।

-তাই সে পারিজাকে গোপনে ঠিক লিখে; তোমার যদি মৈথুনে রুচি থাকে তাহলে অন্য কারো ঘরে গমন করো।

দৃশ্য ০৪

সময় : দিন

স্থান: সুমন্তের বাড়ি

সুমন্ত, স্ত্রী খেমানীকা ও কন্যা পারিজার প্রবেশ।

খেমানীকা : বৎসে, আমাদের বন্ধুর সুন্দর এক পুত্র সন্তান আছে। তোমারই সমবয়সী তার গায়ের রং সোনার মত উজ্জল। আমরা তোমাকে তার কাছে সম্প্রদান করব।

সুমন্ত : শোন মা, ছেলেটার বাবা আমার পরম বন্ধু। আমরা উভয়ে প্রতীজ্ঞা করেছি যে, কারের ছেলে আর কারোর মেয়ে হলে তাদের পরস্পর বিয়ে করিয়ে দেব। পিতৃ প্রতিজ্ঞা পালন করো মা।

পারিজা : (কাঁদো কাঁদো হয়ে) ক্ষমা করো মা বাবা। আমি সংসারী হতে চাহিনা সংসারে আমার কোন আগ্রহই নেই।

সকলের প্রস্থান

বিবেক:

কালজয়ের পুত্র দৃকুলক আর সুমন্তের কন্যা-পারিজা।
ব্রহ্মলোক হতে মনষ্যলোকে করেছেন জন্মগ্রহণ।
সংসার ধর্মে- লোক ধর্মে না হয় কভু তাদের চিত্তমন। নিষাদপতি কালজয় আর নিষাদ পতি সুমন্ত যৌবন কালে হয় সে তাদের গভীর বন্ধুত্ব।
সেই বন্ধুত্ব করতে পোক্ত হতে চাই আরো ঘনিষ্ঠ তাইতো তারা ছেলে মেয়ের দিয়েছেন জোর করে বিবাহ।
বিবাহের পরে থাকেন যদিও একই ঘরে কামপ্রবৃত্তি জাগেনা কভু কাহারো অন্তরে।
এ হলো ধর্মের গতি মহামতি শুদ্ধ চিত্তের প্রকৃতি

প্রস্থান

দৃশ্য ০৫

সময় : দিন

স্থান: কালজয়ের বাড়ি

কালজয় ও পুত্র দৃকুলকের প্রবেশ

কাল জয় : বৎসে, তুমি নিষাদ কুলে জন্মেছ, কিন্তু সংসারি গৃহকর্মে তোমার কোন মন নেই। তুমি কোন প্রাণীই বধ করতে চাওনা। বলত তুমি কি করবে?

দৃকলক : আপনারা অনুমতি দেনত আমি প্রব্যজ্যা গ্রহন করব।

কালজয় : বেশ, যাবে যদি দুজনেই যাও, তুমি তোমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

দৃকুলক : তখনই মাতা পিতাকে প্রনাম করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার তীর ধরে হিমালয়ের দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

প্রস্থান

বিবেক:

দৃকুলক-পারিজা
পূণ্যমতি, পূণ্যবান
পর্ণশালা না করি নির্মাণ
ঘুরতে থাকে হিমালয়ে
কোন খানে না করি অবস্থান
তাহাদেরই শীলতে জে
উত্তপ্ত হয়ে উঠবে
দেবরাজ চক্রের আসন।

প্রস্থান

দৃশ্য ০৬
সময় : দিন
স্থান: দেবরাজ চক্রের আসন

দেবরাজ চক্র ও বিশ্বকর্মার প্রবেশ

দেবরাজ চক্র : (বিশ্ব কর্মাকে লক্ষ্য করে)
বৎস: দু'জন মহাপ্রাণী গৃহত্যাগ করে হিমালয়ে প্রবেশ করে জংগলে ঘুরতেই আছে। তুমি এখনই সেখানে গিয়ে মৃগন্মতা নদীর তীরে তাদের জন্য একটি পর্নশালা নির্মাণ করে দেবে। সেই সঙ্গে পরিব্রাজকের ব্যবহার্য্য সব দ্রব্যের ব্যবস্থা করে আসবে।

বিশ্বকর্মা : যথা আস্তা মহাপ্রভু।
অত:পর মৃগন্মতা নদীর কিনারে পর্নশালা নির্মান করে দিয়ে) এই হলো পাশাপাশি দুটি পর্ণ কুঠির। আর পরিব্রাজকের ব্যবহার্য্য দ্রব্য বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রতিকুটিরেই আছে। তারপর বনের মধ্যে থেকে আশ্রমে যাতায়াতের জন্য একজনের মত একটি রাস্তারও তৈরী করে ছিলাম।

প্রস্তান

দৃকুলক ও পারিজা : বন্য ফল মূল সংগ্রহ করে ঘুরতে ঘুরতে সেই পথ পেয়ে দৃকুলক ও পারিজা সেই আশ্রমে উপস্থিত হলেন।

দৃকুলক : পারিজা দেখতো ঐযে, দুটি ছোট কুটির। চুপ, আস্তে আস্তে আসো। (তারপর তারা উভয়ে নিকটে গেলে) দেখলেন, কোন মানুষের চলাচল বা অবস্থানের কোন চিহ্ন মাত্রও নেই।

পারিজা : দেখি, ঐ ঘরে কি আছে? আচার্য্য! প্রতিঘরেই একজনের ব্যবহার্য্য সব জিনিস রয়েছে। কিন্তু ব্যবহারকারী কোন চিহ্নই যে নেই!

দৃকুলক : আচ্ছা হয়েছে। কোন ঋষিই তো একত্রে একাধিক জন একস্থানে থাকে না। দেখি, তুমি আর আমি দু'জন তো? তাই যতদিন দাবীদার কেউনা আসে তুমি এক ঘরে থাকো, আর বাকীটাতে আমি থাকবো। যখনই কেউ এসে দাবী করে তাহলে বিনাশর্তে ছেড়ে দিব।

পারিজা : ভদ্র : আহরিত ফলমূল খেয়ে নিলে ভাল হয়।

দৃকুলক : হ্যাঁ ভদ্রে: তা অবশ্যই। ইহার পর পারিজাকে বললেন পারিজা তুই প্রব্রজ্যা প্রার্থনা কর। পারিজা প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলে তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন।

দৃশ্য ০৭
সময় : দিন
স্থান: স্বর্গপুরী, দেবরাজ চক্রের আসন

দেবরাজ চক্র : দৃকুলক ও পারিজার জীবনে এক মহাবিঘ্ন ঘটবে। তারা এক সংগেই অন্ধ হবেন। ইহা পূর্ব জন্মেরই কর্মফল। দেখা যাক তাদের হিতার্থে কিছু করা যায় কিনা। (এই ভেবে তিনি দৃকুলকের সঙ্গে দেখা করার জন্য রওনা হলেন)।

প্রস্থান

দৃশ্য ০৮
সময় : দিন
স্থান: হিমালয়ের পাদদেশে মৃগনম্লতা নদীর তীরে দৃকুলকের পর্নকুঠীর।

দৃকুলক : ধ্যানাসনে বসে জপকরে করে আছেন। এমন সময়

দেবরাজ চক্র : ভদন্ত, আপনারা দুজনেই একত্রে অন্ধ হবেন। তখন আপনাদের দেখাশোনার জন্য একটি লাভ আপনাদের পক্ষে নিতান্ত অবশ্যক। সুতরাং আপনারা এখন থেকে লোক ধর্মের অনুসরণ করুন।

দৃকুলক : দেবরাজ এ আপনি কি বলছেন? আমরা যখন গৃহে ছিলাম তখন থেকে লোক ধর্ম ত্যাগ করেছি। এখন বনে এসে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সে লোক ধর্ম কি করে পাল করব? আমরা সম্পূর্ণ কামভাব বর্জিত ও মৈত্রী ভাবাপন্ন হয়ে বাস করছি।

দেবরাজ চক্র : তা যদি না পারেন তবে পারিজ্যা ঋতুমতী হলে আপনি তার নাভিদে-শের হাতদিয়ে স্পর্শ করবেন। তাহলেই তিনি পুত্র লাভ করবেন।

দৃকুলক : তা অবশ্য করা যেতে পারে।

পারিজা : (বাহির থেকে প্রবেশ পূর্বক) কি খবর? কি বললেন, দেবরাজ এতক্ষণ?

দৃকুলক : শোনতে চাও যদি বলবো আমি বিস্তারিত। বসো তাহলে শোন মনদিয়ে। পূর্ব জম্মের কর্মফল না ভোগে যায় না খন্ডন। কিছু কাল পরে তুমি আমি দু'জনে নাকি একই সঙ্গে করতে হবে অন্ধত্ব বরণ। তখন সহায়তার জন্য দেবরাজের পরামর্শ একপুত্র গ্রহণ।

পারিজা : উপায়?

দৃকুলক : না চাও যদি লোক ধর্মে যেতে। আমিও সে কথা বলেছি তাঁকে। দেবরাজের উপদেশ তারপরে, ঋতুমতী হও যদি বলবে আমাকে । হাত বুলিয়ে দিব তোমার নাভিদেশে তাহলেই পুত্র সন্তান তুমি লাভ করিবে।

পারিজা : শুভ হোক তাতে, যথাকালে জানাবো, আমি সেকথা তোমাকে।

প্রস্থান

দৃশ্য ০৯
সময় : দিন
স্থান: পারিজার আশ্রাম

(অত:পর পারিজা ঋতুমতী হলে দৃকুলক তার নাভিদেশে হাত বুলালেন। সেই সময় বোধিসত্ব দেব লোক ত্যাগ করে পারিজার গর্ভে প্রবেশ করলেন। পারিজা গর্ভবর্তী হলেন।)

পারিজা : এই কি জগতের নিয়ম প্রভু; উভয়ে আজীবন ব্রহ্মচারী হয়েও হতে হলো স্বামী- স্ত্রী। লোক ধর্ম ত্যাগ করে সন্যাসী হয়ে বলে এসেও হতে হবে মাতা আর পিতা। কিছুকাল পরে জন্ম নিবে শিশু দিতে হবে তাকে বুকের স্তন, আরও পরে ডাকবে মা বাবা এ বৈরাগ্য জীবনে একী কর্মফল।
(যথাকালে- তিনি (পারিজা) দেবশিশুর মত একপুত্র সন্তান প্রসব করলেন। সোনার মত তার গায়ের রং উজ্জ্বল বলে নাম রাখা হলো সুবর্ণ শ্যাম নিকটবর্তী পর্বত হতেকিন্নরীরা এসে পারিজার ধাত্রী কর্ম কবুল।)

পারিজা : পর্ণশালায় বিছানায় শুয়ে কাপড় ঢাকা অবস্থায় শিশুকে স্তন্য দান করছেন। কিছুক্ষন পর শিশুকে বিছানায় শুইয়ে রেখে দৃকুলকের সঙ্গে কাজ আহরণ করতে যান।

পরীরা : এর কিছুক্ষণ পর দু'জন পরী এসে শিশুটিকে নিয়ে যায় । পর্বত শিখরে নিয়ে গিলে বিভিন্ন খেলা দেয়। ফুল দিয়ে সাজায়। ইহার পর আবার পর্নশালায় নিয়ে এসে বিছানায় রেখে যায়।

পারিজা : ফল সংগ্রহ করে ফিরে এসে শিশুটিকে আদর করে আর স্তন্য দেয়।
(বোধিসত্ব সুবর্ণ শ্যাম এভাবে প্রতিপালিত হয়ে বয়প্রাপ্ত হলেন। তাঁর বয়স যখন ষোল বছর পূর্ণ হয় তাকে আশ্রমে রেখে দূর বলে ফল আহরণ করতে যেতেন। কখন কি বিপদ হয় যে কথা ভেবে মাতা পিতা যে পথে যেতেন বোধিসত্ব সে পথটি লক্ষ্য রাখতেন)।

দৃশ্য ১০
সময় : দিন
স্থান: গভীর বন

দৃকুলক ও পারিজা : (ফল আহরণ করে আশ্রমে ফিরছিলেন। এমন সময় আকাশে মহামেঘ দেখা দিল। প্রবল বৃষ্টির আশংকায় তারা একটি বড় গাছের তলায় একটি উইটিবির উপর দাঁড়াল। সেই উইটিবির মধ্যে এক বিষধর বাষ্প করত। দৃকুলকের ঘামের জল ইউটিবির মধ্যে পড়তে লাগল। জল যখন সাপের মুখে পড়ল তখন ক্ষুব্ধ হয়ে সেখান থেকে বিষ বাষ্প ছাড়তে লাগল। সে বিষাক্ত বাষ্প ছাড়তে লাগল। সে বিষাক্ত বাষ্প চোখে লাগায় তারা দুজনেই অন্ধ হয়ে গেলেন।

দৃকুলক : পারিজা, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা।

পারিজা : আমিও তো কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা।

দৃকুলক ও পারিজা : হায়, আমরা এই বনের মধ্যে দৃষ্টি হারা নাম। কে আমাদের এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করবে? এভাবে তারা হতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

দৃশ্য ১১
সময় : দিন
স্থান: বৈদ্যের বাড়ি
(পূর্ব জন্মের কর্ম কথা)

বৈদ্য (দৃকুলক) : এ রাজ্যের মধ্যে সর্বপ্রকাশ রোগ ব্যাধি চিকিৎসা করার জন্য ও দ্রুত রোগমুক্ত হবার জন্য আসুন চিকিৎসা নিন।

ধনন্তর : নমস্কার, বৈধ্য মহাশয়।

বৈদ্য : হ্যাঁ নমস্কার, ধনন্তর বাবু। বলেন আপনার কি সমস্যা?

ধনন্তর বৈদ্য মহাশয়, আমার চোখে জ্বালা পোড়া করে আর পানি ঝরে। আমাকে ঔষধ দিনতো।

বৈদ্য : (ঔষধ দিতে দিতে) এই নিন। দু'চোখে এক ফোটা করে দিনে তিনবার দিবেন।

ধনন্তর : আচ্ছা ঠিক আছে বলে ঔষধ নিয়ে গেলেন কোন পয়সা দিলেন না।

বৈদ্য : ক্রুদ্ধ হয়ে স্ত্রীকে বলেন, এখন কি করি বলতো? ধনন্তর বাবু আমার থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন, কিন্তু কোন পয়সা দিচ্ছেন না।
(স্ত্রী/পারিজ পূর্বজন্মে) ঐ পাপিষ্ঠের ধন নেবার প্রয়োজন নেই। তুমি কোন কড়া ঔষধ বানিয়ে ওর দু'টি চোখই নষ্ট করে দাও।

বেদ্য : স্ত্রীর পরামর্শ মতো ক্ষতিকারক ঔষধ দিয়ে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টি একে বারেই নষ্ট করে দিলেন। লোকটি অন্ধ হয়ে যায়।

(পূর্ব জন্মে এ কর্মের ফলেই দৃকুলক ও পারিজা দুজনেই দৃষ্টি হারান)

দৃশ্য ১২
সময় : দিন
স্থান: মৃগন্মতা নদীর তীরে দৃকুলকের আশ্রাম

সুবর্ণ শ্যাম/বোধি সত্ব : স্বগত: আমার মাতা পিতা তো অন্যদিন এ সময়ে ফিরে আসেন। আজ কেন এত বিলম্ব হচ্ছে? একটু গিয়ে দেখি বলে তাদের যাবার পথ বেয়ে রওনা দিলেন। (কিছুদুর গিয়ে মা-বাবা বলে ডাকার পর তাদের সাড়া পেলেন নিকটে গেলে দেখতে পেলেন , তারা দুজনেই অন্ধ হয়ে গেছেন)

দৃকুলক+ পারিজা : বৎস এ পথে বিপদ আছে, তুমি আর এসোনা।

সুবর্ণশ্যাম/বোধিসত্ব : একটি লম্বা লাঠি এগিয়ে দিয়ে এই যে, আমার এলাঠি ধরে এগিয়ে আসুন।

মা-বাবা : সেই লাঠির অ ন, এবং আশ্রাম পর্যন্ত পৌছে গেলেন।

বোধিসত্ব : আপনাদের উপয়ের দুটি চোখই নষ্ট হলো কি কারণে?

দৃকুলক : ঝর বৃষ্টি সময় আমরা একটি বড় গাছের নীচে একটি বড় ইউটিবির উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। আর কিছুই জানি না।

পারিজা : আমারও ঐ একই অবস্থা।

বোধিসত্ব : তিনি বুঝতে পারলেন ঐ ইউটিবির মধ্যে একটা বিষধর সাপ আছে। তিনি একবার কাঁদলেন এবং তারপরেই হাসলেন।

মা বাবা : তোমার কাঁদা এবং হাসার অর্থ কি?

বোধিসত্ব : আপনারা যৌবনে চক্ষু হারালেন এ জন্য কাঁদলাম। আর আমি আপনাদের সেবা করার সুযোগ পেলাম এই ভেবে হাসলাম। আপনারা কেন চিন্তা করবেন না। আমি আপনাদের সেবা করবো ।

(যেদিন হতে বোধিসত্ব পরমযত্নে মাতা পিতার সেবা করতে লাগলেন। তিনি তাঁদের জন্য হাত মুখ ধোবার স্নান করার ও পান করার জল এনে দিতেন। বন হতে ফল মূল সংগ্রহ করে ভোজন করাতেন। তারা মল-মুত্র ত্যাগের জন্য যেখানে যেতেন, পর্নশালা থেকে সেখানে পর্যন্ত দড়ি বেঁধে রাখলেন। তারা সেই দড়ি ধরে যাওয় আসা করতেন।)

দৃশ্য ১৩

সময় : বিকাল বেলা

স্থান: মৃগন্মতা নদীর তীরে

বারানসী রাজ পিরিযক্ষ : স্বগত- আমি রাবানসীরাজ পিলিযক্ষ। মৃগমাংস চাই আহারে সকালে বিকালে। তাই মাতার উপর দিয়ে সমস্ত রাজ্যভার এসেছি হিমালয়ে নিত্য নতুন করতে মৃগ শিকার। ডালপালা আর লতাপাতা দিয়ে একটা খাসা বানিয়ে বিষ মেশানো তীর ধনুক সহ লুকিয়ে আছি সেই খাসার ভিতরে।

বোধিসত্ব : ফলমূল গুলো রাখলাম, আমি নদীতে স্নান করে, জল নিয়ে আসি বলে বের হলেন।

পিলিযক্ষ : ভাবলেন, একটা শর দ্বারা লোকটাকে কিছুটা আহত করে, তার কাছে গিয়ে পরিচয় জিজ্ঞেস করবেন। লোকটা দেব, নাগ কি গর্ন্ধব? নাকি মানুষ বোঝা যাচ্ছে না।

বোধিসত্ব : হাত ধুলে কলসী পরিস্কার করে কলসীতে পানি ভর্তি করে নদীর কিনারে রাখলেন। তারপর স্নান করে এই কুলে উঠলেন, কুলে উঠে দাঁড়াতেই রাজা শরছুড়লেন শরটা খুব জোরে নিক্ষিপ্ত হলো। সেই বিষাক্ত শর বোধিসত্বের বাম পাশ ভেদ করে বের হলো। তিনি নদীর বালুকা বেলায় পড়ে গেলেন। অতিশয় যন্ত্রনায় কাতর কলেন, বুঝলেন, তার মৃত্যু অনিবার্য। রাজাকে দেখে বললেন, তুমি কে? আমার মাংস তো ভোজ্য নয়? কেন তুমি আমার শরবিদ্ধ করলে? এই কী বীরের কাজ?

পিলিযক্ষ : আমি বারানসীর রাজা পিরিযক্ষ। মৃগমাংস লোভে বনে বনে ঘুরে বেড়াই। তোমাকে দেখে মৃগরা পালিয়ে যাচ্ছিল বলে আমি তোমাকেই শরবিদ্ধ করলাম। তোমারা পরিচয় কি?

বোধিসত্ব : আমি নিষাদের পুত্র নাম শ্যাম। ঐ আশ্রমে আমার অন্ধ মাতা পিতার সেবা করি। তুমি মিথ্যা বললে, এই বনে মৃগ বা কোন প্রাণী আমার ভয় করে না। তারা সবাই আমাকে ভালবাসে। আমার কোন শত্রু নাই। আমি কারোর হিংসা বা ক্ষতি করি না। তাই আমার ভয়ে কেউ পালায় না।

রাজা পিলিযক্ষ : অনুতপ্ত হয়ে ভাবলেন, এই যুবক ব্রহ্মচারী ও ধার্মিক এ আমাকে তার হত্যাকারী জেনেও ক্ষুদ্ধ হচ্ছে না বা আমাকে কুবাক্য বলছেন না। বললেন, আমি অন্যায় ভাবে আমাকে শরবিদ্ধ করেছি। সত্যিই আমি অপরাধী।

বোধিসত্ব : মরন ভয়ে কাতর হচ্ছিনা। একদিন সকলকে তো মরতে হবে। আমি শুধু আমার অন্ধ মাতা পিতার জন্য কাতর হয়ে পড়েছি। আমি না থাকলে তারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় মারা যাবেন। কে তাদের সেবা করবে ?

রাজা : তুমি ভেবোনা। আমি পুত্রের মত তোমার অন্ধ মাতা পিতার সযত্নে সেবা করব। এইভাবে আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত করব। তুমি শুধু বলো তোমাদের আশ্রম কোথায়?

বোধি সত্ব : রাজাকে আশ্রমের পথ দেখিয়ে দিয়ে মাতা পিতার উদ্দেশ্যে প্রনাম জানিয়ে চৈতন্য হারিয়ে ফেললেন। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

রাজা : রাজা তখন শোকে ও পাপভয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

বহু সুন্দরী : (তিনি গন্ধমাদন পর্বতে বাস করতেন। অতীত সপ্তম জন্মে বোধিসত্বের জননী ছিলেন। তিনি সেই মুহুর্তে বোধিসত্বের কথা ভেবে সবকিছু জানতে পেরে তৎক্ষনাৎ মৃগন্মতা নদীর তীরে শূণ্যে অবস্থান করেন।

বিলাপ রত রাজাকে বললেন, তুমি মহাপাপ করেছ। এক শরাঘাতে পুত্র, মাতা, পিতা তিনজনকে বধ করলে। এখন তুমি অন্ধ মাতাপিতার পোষণ করবে।

পিলিযক্ষ রাজা : তাঁর অপরাধ স্বীকার করে জলপূর্ণ কলসটি নিয়ে আশ্রমে উপস্থিত হয়ে দৃকুলক পন্ডিতকে বললেন, আমি বারানসীর রাজা পিলিযক্ষ আমি মৃগন্মতা নদীতীরে মৃগবধের জন্য এক জায়গায় লুকিয়ে ছিলাম। আমি ক্রোধ বশে তোমাদের পুত্রকে শরাঘাতে বধ করেছি। আমাকে ক্ষমা কর।

পারিজা : (ক্রুদ্ধ হয়ে-ইনি আমাদের পুত্রকে বধ করলেও আমরা যেন তাঁকে শাপ না দিই। ইতি আমাদের রাজা। আমাদের সম্মানের পাত্র।

রাজা : আমি আপনাদের সর্বনাশ করেছি। তবু আপনারা আমার প্রতিক্ষুদ্ধ হয়ে শাপ দিচ্ছেন না। প্রিয় সম্ভাষন করে সম্মান প্রদর্শন করলেন। সত্যই ধর্ম কি জিনিস তা আপনারাই জানেন। আজ হতে আপনি হলেন আমার আর এই দেবী হলেন আমার জননী। আমি পুত্রের মত আপনাদের সেবা করব। রাজ্যে আমার প্রয়োজন নেই।

দৃকুলক : আপনি রাজা হয়ে আমাদের দাস হবেন-এটা শোভা পায় না। আপনি বরং এই লাঠিটার একপ্রান্ত ধরে আমাদের শ্যামের কাছে নিয়ে যান।

রাজা : ঠিক আছে, আসুন তাহলে রাজা তাদের নদীতীরে শ্যামের কাছে নিয়ে বললেন, এই যে, আপনাদের পুত্র।

পারিজা : শ্যামের বুকে হাত দিয়ে দেখলেন, তাঁরপুত্র এখনো মরেনি। বিষক্রিয়ার ফলে সে মূর্ছিত হয়েছে। তিনি বললেন, বিষ ক্ষয়ের জন্য আমি সত্যক্রিয়া করব। শ্যাম চিরদিন ধর্মপথে চলেছে, সে কোনদিন ব্রহ্মচর্য ভঙ্গকরেনি, সে কোন দিন মিথ্যা কথা বলেনি। সে অগাদ ভক্তিভরে মাতা পিতার সেবা করেছে। এসব কথা যদি সত্য হয়। তাহলে তারদেহের বিষ ক্ষয় হোক। আমিও শ্যামের পিতা এতকাল যে পূণ্য অর্জন করেছি তার প্রভাবে তার দেহের বিষবীর্য ক্ষয় হোক। (মায়ের সত্যক্রিয়ার ফলে বোধিসত্ব- পাশফিরে শুলেন)

দৃকুলক : শ্যাম সর্বদা ধর্মপথে চলে সত্যের অনুসরণ করেছে, শ্যাম আমার প্রাণ হতে প্রিয়তর একথা যদি সত্য হয়-তবে তার দেহের বিষবীর্য ক্ষয় হোক। আমিও শ্যামের মা এতকাল যে পূণ্য অর্জন করেছি, তার প্রভাবে তার দেশের বিষবীর্য ক্ষয় হোক। (বোধিসত্ব এবারও পাশ ফিরে অন্য পাশে ভর দিয়ে শুনোন)

অত:পর বহুসুন্দরী: আমি যতদিন গন্ধমাদন পর্বতে অদৃশ্য অবস্থায় আছি, শ্যামের চেয়ে প্রিয়তর আমার কেউ নেই, একথা যদি সত্য হয়, তাহলে শ্যামের দেহের বিষবীর্য ক্ষয় হোক।

(এ তিনজনের সত্যক্রিয়ার ফলে বোধিসত্ব বিষমুক্ত হলেন)

দৃশ্য ১৪
সময় : দিন
স্থান: মৃগন্মতা নদীর তীর

বহুসুন্দরী : যে কারণেই হয়ে থাকুক আপনাদের এ অন্ধত্ব বা কর্মফল আজ পর্যন্ত বহুদিন ভোগেছেন। আজ নিমিষেই দূর হোক সেই অন্ধত্ব। (এই বলে স্থানে ফিরে গেলেন। দেব কন্যার বরে বোধিসত্বের মাতা পিতা উভয়েই দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন)

বোধিসত্ব রাজা ও মাতা পিতার সংঙ্গে আশ্রমে ফিরে গেলেন।

রাজা : কি আশ্চর্য? কি আশ্চর্য?

বোধিসত্ব : ওহে রাজন, স্বীয় মাতা পিতার সেবা করবেন। স্ত্রী পুত্র পরিবার বর্গকে পালন করবেন, মিত্রদের প্রতি মিত্র ধর্ম রক্ষা করবেন, ক্ষক্রিয় হিসেবে যথাধর্ম যুদ্ধ করবেন, শ্রমন ব্রাহ্মনকে শ্রদ্ধা করবে না। ইতর প্রাণীদের ও দয়া করবেন। এই ভাবে যদি ধর্মচর্চা করে চলেন-তাহলে দেহান্তে ধর্মবলে স্বর্গলাভ করবেন।

রাজা : অবনত মস্তকে এই সকল উপদেশ গ্রহণ করলেন। তারপর বোধিসত্ব ও তাঁর মাতা পিতাদের প্রনাম করে বারানসীতে ফিরে গেলেন।

বোধিসত্ব : মাতা পিতার সঙ্গে তপস্যা করতে করতে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করে ব্রহ্মবিহার ধ্যান করতে লাগলেন।

সমাপ্ত

চরিত্র

পুরুষ :	নারী
১। কালজয়- নিষাদ দলপতি (দক্ষিণ)	১। বিন্দুমতি-- কালজয়ে স্ত্রী
২। সুমন্ত- নিষাদ দলপতি (উত্তর)	২। খেমানী কা -- সুমন্ত এর স্ত্রী
৩। দৃকুলক- কালজয়ের পুত্র	৩। পারিজা - সুমন্ত এর কন্যা
৪। তিন্ধুক-- খেয়াপারে মাঝি	৪। বিনতী --- ধাত্রী
৫। ধনন্তর --- পূর্ব জন্মে মহাধনী ব্যক্তি	৫। শংখমালা- গ্রামের লোক।

মানুষ দেবতা

পণ্ডিত শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

সংগ্রহে - কর্মধন তঞ্চঙ্গ্যা

(তৃতীয় অঙ্ক)

(চতুর্থ দৃশ্য)

স্থান : মচল গ্রাম মঘবা গৃহ

(সুধর্ম্মা-নন্দা-চিত্রা প্রবেশ)

সুধর্ম্মা : দেয় বোন। গ্রামের গ্রামের সব পুরুষেরা মিলে এক সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা তৈরী করতেছেন। সেই পূণ্যের প্রভাবে পুরুষেরা স্বর্গে যাবেন। আর আমরা নারী হয়ে যদি কিছু পূণ্য কর্ম না করি আমাদের উপায় কি হবে।

নন্দা : তা ঠিক বলেছন দিদি। আমরা হলেম মেয়ে মানুষ। কি কাজ করলে তাদের পূণ্য অংশের ভাগী হতে পারি।

চিত্রা : দিদি! আমাদের ও চিন্তা করে একটা উপায় বের করতে হবে। আমরা মেয়ে মানুষ বলে কি পূণ্য কর্ম করতে পারব না?

সুধর্ম্মা : বোন! মনের মধ্যে ইচ্ছা থাকলে না পারার মত কোন কাজ নাই। তবে আমি চি ন্তা করতেছি সেই ধর্মশালার একটা চূড়া তৈরী করে দিয়ে তাদের পণ্যাংশের ভাগী হবো।

নন্দা : দিদি! আমার ইচ্ছা সেই ধর্মশালার পার্শ্বে একটা পুষ্করিনী খনন করে দিব। যাতে দিবা রাত নরনারী পশু পাখী কীটপতঙ্গ সকল প্রাণী জলের তৃষ্ণা পেলে জল পান করে তৃষ্ণা দূর করতে পারেন। তাহাতে আমার হবে দিবা রাত পূণ্য সঞ্চয়।

চিত্রা : দিদি! আপনারা পূণ্য কর্ম করবেন আর আমি বসে থাকবো আমিও ধর্মশালা চার পার্শ্বে একটা সুন্দর ফুলের বাগান করে দিয়ে পূণ্যভাগীহবো'

(সূত্রধর প্রবেশ)

সূত্রধর : এখানে মেয়ে মানুষের কিসের আলাপরামর্শ চলছে।

সুধর্ম্মা : আমাদের গোপন বৈঠকে হঠাৎ আপনী এলেন যে- আর যখন এসে পরলেন তখন কিছু শুনে যান। তবে -

সুত্রধর : তবে মানেতো বুঝতে পারলেম না।

সুধর্ম্মা : তবে মানে হলো- আপনাকে যদি খুব মিষ্টি আচ্ছা করে খাবায়েদি তা হলে আমার একটা উপকার করেদিতে পারেন কী?

সুত্রধর : তাতো নুনখেলে গুন করতে হয়। আর মিষ্টি খাওয়ালেতো কথায় নাই।

সুধর্ম্মা : ভাই সূত্রধর! আমাকে একটা উপায় বলে দিন না।

সূত্রধর : দিদি! কথাটা খুলে না বললে আমি কি করে জানবো বল।

সুধর্ম্মা : গ্রামের পুরুষেরা সবমিলে একটা ধর্মশালা তৈরী করছেন। তাহাতে আমার যাতে পূণ্যাংশ লাভ হতে পারে সেই উপায়টা বলে দিন।

সূত্রধর : ও সে উপায়? সেতো আমার হাতে। আগে কি মিষ্টি খাবাবেন খাবান। তারপর এমন উপায় করে দেব যে সেই ধর্মশালার পণ্যাংশ ষোলআনা পেতে পারবেন।

সুধর্ম্মা : ভাই সূত্রধর। তা হলে কিছুক্ষণ অপক্ষো করুন। আমরা কিছু মিষ্টি তৈরী করে নিয়ে আসি। চল বোন।

(সুত্রধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

সূত্রধর : আমাকে যখন মিষ্টি খাবাবে তখন তাদের কে নিশ্চয় কিছু উপকার করে দিতে হবে। আমি একটা ধর্মশালার চূড়া তৈরী করে দেব। দেখা যাক মিষ্টি যদি খাবায়।

(মিষ্টির থালা হাতে লইয়া সূধর্ম্মা নন্দা ও চিত্রা প্রবেশ)

সুধর্ম্মা : ভাই সূত্রধর! একবার হাত মুখ ধুয়ে মিষ্টি মুখ করুন।

(মিষ্টির থালা সুত্রধর কে দিল)

নন্দা : মোহন ভোগ, লাল মোহন, ক্ষীর মোহন, মাজা, গজা, রসগোল্লা যেইটা পছন্দ করেন।

চিত্রা : সদ্য তৈরী করা জিনিষ। একটু খেয়ে দেখুন মিষ্টি কেমন হয়েছে।

সূত্রধর : (কিছু মিষ্টি খেয়ে) মিষ্টি ভারী মজা হয়েছে। কোনটা রেখে কোনটা খাই। (সুত্রধর কিছুক্ষণ মিষ্টি খাওয়ার পর) সগত: বা: চমৎকার মিষ্টি। এবার পেটভরে খুব মিষ্টি খেলাম। মিষ্টি যেমন খেলাম তেমনি তার উপকার আমার করতে হবে।

সূধর্ম্মা : আচ্ছা ভাই সূত্রধর! উপায়টা একবার বলুন না। কি করলে পূণ্যভাগ পেতে পারি।

সুত্রধর : দিদি! মিষ্টি খাবানো অনেক গুন আছে। ধর্ম্মশালার ষোল আনা পূন্যাংশ যাতে পেতে পারেন। আমি একটা সুন্দর চূড়া তৈরী করেদেব ধর্মশালার কাজ তৈরী হলে সেই চুড়াটা ধর্মশালার মাথার উপর বসানো হলে তখন ধর্মশালার নির্মাণ কাজ শেষ হবে।

সুধর্ম্মা : পুরুষেরা যদি তাতে কোন রূপ আপত্তি করে থাকে।

সূত্রধর : যেতে আমার কথা তারা যাহাই আপত্তি করুক না কে- সব কাজ আমার হাতে। আমি যেই চূড়াটা গড়েদিব সেই চূড়াটি খুব যত্নে কাপড় মুড়িয়ে গোপনে রেখে দাও। যখন প্রয়োজন হবে তখনঠিক ভাবে কাজে লাগিয়ে দেব আমি।

সুধর্ম্মা : ভাই সূত্রধর: বেশ! তা-হলে আমি খুব যত্নে চূড়াতা কাপড় মুড়িয়ে রেখে দেবো।

নন্দা : ভাই সূত্রধর। আমরা তিন বোনে মিলে মিষ্টি খাবালেম। দিদির জন্য চূড়া করলেন। আর আমার জন্য কি উপায় করবেন।

সূত্রধর : নন্দাদিদি! ধর্ম্মশালার পার্শ্বে একটা সুন্দর পুষ্করিনী হনন করে দিবেন। আর চিত্রাদিদি একটা ফুলের বাগান করে দিবেন।

চিত্রা : ভাই সূত্রধর। আপনার উপদেশ মতে আমি একটা ফুলের বাগান করে দেব। ধর্মশালার চার পার্শ্বে নানা রঙের ফুল ফুটবে। তখন ধর্মশালার সৌন্দর্য্য বব্ধন করবে।

সূত্রধর : দিদি: আমি যহা বলে দিচ্ছি ঠিক তাই করবে। সূধর্ম্মা দিদি দিবেন ধর্ম্মশালার চূড়া, নন্দা দিদি পুস্করিনী, আর চিত্রা দিদি ফুলের বাগান করে দিয়ে ধর্ম্মশালার পূন্যাংশ ষোল আনা ভাগী হবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আচ্ছা দিদি এবার আমি । (সূত্রধর প্রস্থান)

সুধর্ম্মা : আমি যেমন চিন্তা করেছি তেমনি আমার আশা সফল হবে খুব যত্নে চূড়াটা আমি কাপড় মুড়িয়ে দেব।

নন্দা : আমি যাহা ভেবেছি তাহাই করে দেব। চল বেলা অনেক হল।

(সকলের প্রস্থান)

(একাকী সুজাতা প্রবেশ)

সুজাতা : সুধর্ম্মা, নন্দা, চিত্রা, তাদের কথা হলো: শুধু ধর্ম্মশালার তৈরীর পূণ্যভাগ কি করে পাবে। পুরুষেরা করলে কি সেই পূণ্য অংশ আমরা ভাগ পেতে পারি না। আমিও সব পূণ্য ভাগের কথা বুঝিনা। আমার কাজ হলো এই ভরা যৌবনে অঙ্গের চর্চা করা রূপের চর্চারা আর সৌন্দর্য্যের চর্চা করতে করতে আমার দিন কেটে যায়। বাজারে যত রকমের প্রসাধনী পাওয়া যায় প্রতিদিন সকালবিকাল দুই বেলা সুগন্ধি সাবান দিয়ে গা ধুয়ে তার পরে স্নো পাউডার গায়ে মাখতে হয়।

(গীত কণ্ঠে ধর্ম্মানন্দ প্রবেশ)

এ অনিত্য সংসার মাঝে
মিছে কর কেন রূপের বাহার।
এ রূপ যৌবন, চিরদিন আর
থাকবে না-তোমার।
ঐ আতর গোলাপ সুগন্ধি মেখে গায়,
বৃথা কর তুমি রূপের বড়াই
এই দেহ শ্মশানে পোড়ে হবে ছাই।
কুকুর শৃগালে করবে আহার।
ওরে মিছে কর কেন রূপের বাহার।

(ধর্ম্মানন্দ প্রস্থান)

সুজাতা : আমার সামনে ওসব বল্‌লে লাভ কি হবে বাবা। আমার ভরা যৌবনের রূপ কে রঙিন করে রাখতে হবে।

(গীত কণ্ঠে ধর্ম্মানন্দ প্রবেশ)

রঙিন দেহ হবেরে ময়লা
চেয়ে কেন দেখিয় না।
পরপারে লাগি তুমি
মনে কেন ভাবিয়না।
এই রূপ ভরা যৌবন
ক্ষনস্থায়ী বিদ্যুৎ যেমন।
মূর্খ তুমি জানিস না। ঐ

(ধর্ম্মানন্দ প্রস্থান)

সুজাতা : ঐসব কথা বলবার বুঝি তুমি আর স্থান পেলে না। মহাসুগন্ধি কেশ তৈল মাথায় দিয়ে মেঘের মত ঘন কালো চুলে বেনী বাধতে হবে। গায়ে চন্দনের যার মেখে এই ভরা যৌবনের দেহকে ফুটন্ত গোলাপ ফুলের মত রাখতে হবে; যার সুগন্ধি সাবান দিয়ে স্নান করতে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক
(পঞ্চম দৃশ্য)
স্থান : মচল গ্রাম।
(মঘবা, সুদাম, শীলানন্দ, সত্যানন্দ ও সুত্রধর প্রবেশ)

মঘবা : ভাইসব? এবার আমাদের ধর্ম্মাশালার কাজ প্রায় হয়ে যাচ্ছে পূর্ব পার্শ্বে অতিথশালা, দক্ষিন পার্শ্বে অন্নছত্র ভোজন শালা, আর পশ্চিম পার্শ্বে জলছত্র, আর উত্তর পার্শ্বে পান্থশালা হচ্ছে। পথিক গন দিন ভিখারী দরিদ্র গরীব কাঙ্গালেরা সদা সর্বদা এখানে সুখ-সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

সুদাম : সুদক্ষ কারিগরের কাকা কিনা কাজের কোন অবহেলা নাই।

শীলানন্দ : কাজে অবহেলা করলে কারিগরের ভাত জুটবে না।

সত্যানন্দ : একে বারে নিখুঁত কাজ আর বলতে হয় না।

মখবা : সূত্রধর যদি কাজে অবহেলা করতো এত শিগগির এই বৃহৎ ধর্মশালা নির্মাণের কাজ শেষ করা সম্ভব হতো না।

সুত্রধর : কিন্তু একটা কাজ মাত্র বাকী আছে। তা হলো ধর্ম্মশালার চূড়া বসানো।

সুদাম : তা হলে শিগগির একটা চূড়া তৈরী করে ধর্ম্মশালার কাজ শেষ করেন।

সূত্রধর : চূড়াতা কাঁচা গাছের হয় না। শুকনা কাঠের দরকার হবে।

শীলানন্দ : এমন আমরা শুকনা কাঠ পাব কোথায় বলুন।

সূত্রধর : কারো ঘরে তৈরী চূড়া পাওয়া যায় কিনা দেখুন না।

চলমান

মঙ্গল সুত্র

আর্য্য জ্যোতি ভিক্ষু

মঙ্গল সুত্রবা উলরে বারিকগুইনান বুদ্ধ ধমর ত্রিপিটক-অ পুরা সিক্ষ্যানি। সুত্রবা আথকথা অনুজায় মঙ্গল উলরে কাম গুইনান দিন দিন ধনে গ্যানে সুগে শান্তিয়ে জয় অনা। সুত্রবাত উপদেশ আগে পরিবারত কিগুই নেগে মুগে পয়আই সআই কিগুই বরন পুসন গয়া পয়ে। নিয়ম নীতি মানি চলা পয়ে ই জীবনত ধনে মানে আপ্রমাত গুই দান সিল পালেনান মন সংজম গুইনান সুগে শান্তিয়ে জীবন খারাজাই। পুরিবারত জুদি সুগ-শান্তি থাই হালে বন্দু বান্দপলই র-অ মিলিনান আরামত নিজ আত্মীয় দুক্ক্যাগুই সুগে শান্তিয়ে কারাজাই।

সিবারা সুত্রাবাত আগে একজন মাঙ্স্যত কার কি দায়িত্ব পালেবাত আগে । জার জার দায়িত্তনি (কামানি) জুদি গমেগুই গুইজান্দে অই হালে পরিবারত আ সমাজত ক-ন জামেলা দেগা ন-অ দিব । পরিবারত জুদি সুগ শান্তি তায়রয়ে অ -য় হালে আরামত আ পুরা দেসত সুগ শান্তি দেগা দিব।

ই সুত্রাবা নিয়ম নিতিনি জে কুন-অ জনে পালে পে। কারন বুদ্ধর কর্মবাদ অনুজাই জে গম কাম গয়ে তে হামাকাই সুখ শান্তি পেবার উপায় উব। আম-অ বিসি জুদি লাগেলে হালে আম হেই পেব-অ। আম লাগেনান কন-অ কাতল ফল ন-পেব। স্যপাগি ই-সুত্রবাত জেরক্কানি মঙ্গল অইরেধ কাম(উপায়) আগে সি সিক্ক্যানি জুদি পালে পাইলয়ে নিজ পাগি আ পরেয়া পাগি-অ সুগ শান্তি জীবন কারেবার ভ-অ গুইপে। ই-সুত্রবা তঞ্চঙ্গ্যা খরাই ভাঙ্গারে আমি ধ্যান ভান্তে সিজ্জ্যনিয়ে মিলিনান ভাঙ্গেয়ে। সুত্রবাত বাংলা।

ঘটনা

বার-অ বস সং দেবতানি আ মানুস্স্যানিয়ে ভাব্প্যন কি গুইল্যে মঙ্গল অয় স্যান হব ন-পান্, সুনিবাত মনে কৈনান-দ সুনি ন-পান আত্রিত্স্যান মঙ্গলানি জ্যান ব্যাক পাপানি নাইত্গুইয়া দাঙ-অ সুদ্ধ সাঙ্গ দেবতা বুদ্ধ ব্যাক মাইঙ্স্যঅ গম-অ পাগি দেসনা গুয়ে, সি মঙ্গল-অ খরানি কৈ জ্যঙত্.

সুত্র

মুই ইক্ক্যা-গুই সুন্যং ভগবান বুদ্ধ এক সময়ত স্রাবস্তি খায় অনথাপিণ্ডিক স্রেস্তি দান্-গুয়া ক্যঙত জেতবনত থের-অ. জক্কে গুবিঙ রাইত উয়ে এক্য়া দেবতা জে ব্যাক্ জেতবনান পক্-পক্ গুই জলে জ্যে ভগবান বুদ্ধ সিরি আইত স্যেরে। খাই এই আয় ভগবানে বুদ্ধে জু গুই-গাই এক খাইত্তি থিয়ে রূয়েরে. টিয়ে-নান ভগবানে গাথা-লৈ মন্-গুইনান খত্তে:

১. এক্কু দেবতাই আ মাঙ্স্যে সুগ-সান্তি মনে কৈনান মঙ্গল-আনি সম্বন্দে ভাব্প্যন (মাত্তে কনেয়-অ হব-ন-পান্) মুই কুসালি গঙত (ভগবানে) মে খ-অ (ব্যাগ-অ তুন গম) উত্তম-মঙ্গল কি?

২. মুরুক্কনি ভুজনা ন-গ-আনা, গ্যানি-গুনি আ পুণ্ডিত্তানিয়ে ভুজনা গ-আনা, পুজা গুইবার জনে(মাঙ্স্যে) পুজা গ-আনা, ইয়ানি উলঅরে উত্তম মঙ্গল্.

৩. পুণ্য আ গ্যান পায়রে জাগাত থা-না, আগৈ গুয়া পুণ্য থেলে, আ নেজঅ-এ উচু পরে নিসানা, ইয়ানি উলঅরে উত্তম মঙ্গল্।

৪. নানান বিদ্যা সিগিনান্, সিল্প-কলা জানিনান্, গম নিতিলৈ সিক্খ্যা ওই, গম খরা ক-আনা, ইয়ানি উলঅরে উত্তম মঙ্গল্।

৫. মা-বাপ পালানা, মুক প-আ রিনি-সানা, হুতি ন-উয়া-গুই জিন্কানি কারানা, ইয়ানি উলঅরে উত্তম মঙ্গল্।

৬. দান গ-আনা, ধর্মনিতি পালানা, লুকুরুম আ সং-সমাত্স্যায়াই গমে গুই উচি দ-আনা, দুইত নিয়া (কুশল্) কাম গ-আনা, ইয়ানি উলঅরে উত্তম মঙ্গল্।

৭. মনলৈ বসং চিরা ন্-অ গ-আনা, গ্যালৈ আ খরালৈ বসং কামত্তুন দু-অত থানা, মত্-বাঙ ন্-খানা, আ ধর্মে অবহেলা ন-অ গ-আনা, ইয়ানি উলঅরে উত্তম মঙ্গল্।

৮. সম্মান পেবাত মাইন্স্যে সম্মান দেনা, বাহাদুরি ন-অ গ্-আনা, খুসি গুই থা-না, আ কৃতগতা-অনা, ইয়ানি উলঅরে উত্তম মঙ্গল্।

৯. দুজ্য-সুজ্য গুণ থা-না, গম খরা দ-আনা, সিলবান ভান্তে-স্রমন-দোই দেগা গ-আনা, আ সময় মুজিম ধর্ম চজা গ-আনা, ইয়ানি উলঅরে উত্তম মঙ্গল্।

১০. তবনা গ-আনা, আর্য্যো সত্য বুসি পানা, আ নির্বানান হবপানা, ইয়ানি উলঅরে উত্তম মঙ্গল্।

১১. লোক ধর্মলৈ ক-ন মন নঅ- ল্যেয়্, মন-দুক্খ ন-থা-না, লোভ-পৈ লেৎপেত ন-থানা আ পাব-খাচারানি দোই পেলেনান বলপিয়া গুই থানা, ইয়ানি উলঅরে উত্তম মঙ্গল্।

১২. ইক্ক্যা গুই সুলি-পাইল্যে (তা) জিরি জেরাক সাত তা সিরি জয় অন আ বল পিয়া গুই থান্, তার ইনি উলরে উত্তম মঙ্গল্।

লেখক পরিচিতি ঃ পেরাডানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীলঙ্কা।

Fathomless Aspiration

Punang june tanchangya

Watch all the flowers, dance with the winds
Listen to snowflakes whisper your name
Feel all the wonder lifting your dreams
You can fly!
Ups and downs are common in life
But, never give up.
Keep calm and make the situation yours.
Defeat all the fear
Challenge all the darkness,
All the odds will come in your grip.
No one can snatch your dreams,
Cause you are the only king of your own world
Never gonna stop chasing our dreams,
They are the only things which makes us alive
Live your life for achieving that destination,
Which is the meaning of our living.

Student : Class-10, Feni Girl Cadet college.

বাচিবং কেনে ভাবরনী

রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা

ও ও বাপ-ভাইলক্
ও ও মা বোনলক্,
ও ও জাত কুড়মলক্
ও ও জুম্মোয়া লক ॥

বেল্লোয়া হ্‌আলেয়ে
খরক্ যেবা ঘুম,
সময় থাক্কে পথ ধর
ঔই গেলং ব্যাক্ থুম ॥

দিন দিন বাত্তন মানুইত্
অভাব আইছের চাবি,
ঝাড়ত মুড়াত্ যুগ যার
আন্ধারত আঘি ডুবি ॥

চুগ্ থাক্কে অন্ধ আমি
মদে ভাঙে জীবন,
লেঘাপড়া শিগিত্ত ঔই
সারুবা দিক্যা মন ॥

দয়ামায়া উড়ী গিয়ে,
লোভ ঈংসা অহংকার,
বাপ-মা গুরু ন-মান্দন
পাবে ভরা সংসার ॥

উবকারত্ ক্ষতি চিন্তা
মান্যতা নাই ধাঙ লগর,
জু নাই বাহাদুরী তার
নিজরে ভাবে বিদ্যাসাগর ॥

খেবার দিবার থেলে
ব্যাক্কুনে্ কুড়ুম্ হ্‌অয়,
দুগর কালত মু ফিয়ান
যেন্ কেঅ কার নয় ॥

মন গড়া গুইয়্যন্ কত্তাবাবু
কুগিয়ে কাবিলাক শত,
কালী ভক্ত আমা রাচা
ম্যিচিলিক ডর ই-মনত্ ॥

আদারশ সত্তোর সালত্
রিজাভ উল ই-জিলাত্,
স্যেট্রা উলাক জ্ঞাতি গুত্তি
বানা বুগি লোই ধায় লেগাক ॥

উন্দুবন্যা ফিউংবন্যা
শুগবন্যা এল ই-জিলাত্,
এক রাইয়্যত জুম ধান
শেত্ ঔই, এল ভাতরাদ্ ॥

বিয়াল্লিশর মহাযুদ্ধ
টেঙা চোল নাই উবাইস্,
মানষ্যর মরা ঈসাব নাই
ঝি-পআ বিচিলাক ॥

বর দশা সাইট সালত
কাপ্তেই গড়া পানি,
ভুই জুমি ডুবি গেল
লক্ষ জনর কানাকানি ॥

বাহত্তোরত আইসা ধুল্যাক্
ল্লাক্ ল্লাক্ বাঙাল,
কায় নিলাক জাগা জুমি
কায় নিলাক জানমাল্ ॥
তিয়াত্তোর জুম্মোয়া লগে
হ্‌আত্যার ধুরি উসেলাক্,
ভুল বুচাবুচি জাত ভাই
লাম্বা-বারী ভাগ উলাক ॥

রাইংখ্যং দ্বিকুল টেঙা গাইত
সনা থালাত ভাত,
সাত বাদশা ধন আমার
ভালা উলাক অন্যজাত্ ॥

ধর্ম নাঙে ধার্মিক সাজি
দ্বি-ভাগ উলাক ঠাগু দল,
সাধক নাঙে ই পাজ্যামী
দায়গর দান রসাতল ॥

ভাবনা ধুতাঙ্গ ধ্যানী
পার্বত্য-বন ভিক্ষু দল,
মূর্খ দায়ক কি জানে
সাধক সাজি ই কোশল ॥

ঘুষ দায়ক চাগুরী নাই
ঘুষ খায় সাব পিয়নে,
ঘুষ দিলে ভাগ্যবান তে
বুচি ন-পাল্ল্যং জীবনে ॥

বিদ্যুৎ পানি পোরকর
মাফ নাই রাজাত্তুন
কন শাসনত আঘি আমি
ভাবি ন-পাল্ল্যং মনত্তুন ॥

জাত সেবা পর উপকারীত
শিক্ষা-সংস্কৃতি ভালেত নাই,
ফাগী বাজী পাটি মিছিল
ইয়ানত্ গেলে টেঙা পায় ॥

ক্যঙত গেলে ধর্ম নয়
ধর্মত্তুন বেগ কর্ম মানিবা,
সমাজ সেবা আসল ধর্ম
ইয়ান তুমি জানিবা ॥

পআ সয়ারে মান্যতা শিগ
মিলি মিশি থেবং বেক্কুন,
আমা কবালত সুগ এব
শুনিবা জানিবা গুনীত্তুন ॥

জাত সমাজর কাম গর
এগতা হ্অ ব্যাক্কুন,
সাত্তোয় গছা এক্কোয়া জাত
ভাবিবা বুচিবা মনত্তুন ॥

দোন্যা কারবা মংলা
মুঅগছা আর ল্লাং,
ম্লেলং অর অঙ্যগছা
সাত গছার সাত নাং ॥

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : জরীপ ও বন্দোবস্তী শাখায় ভূতপূর্ব সরকারি আমিন। চিত্রা, তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি (মূল পান্ডুলিপি), তঞ্চঙ্গ্যা জাতি, গীতপোই, চারুকলা অনুশীলন, আত্মচরিত্রবলী নামে ছয়টি পুস্তক প্রকাশক, সাবেক সদস্য রাঙামাটি জেলা পরিষদ, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৭ ইং। প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ রাঙামাটি চারু কলা একাডেমী।

বিষু ও মঅর ভাবনা

রচনাঃ রত্না তঞ্চঙ্গ্যা
তারিখঃ-২৭/৩/২০১৭ইং

বিষু তুই আমা জুন্মো জারত্ অহংকার
বিষু তুই আমা নআ স্ববনর পুববেল
বিষু তুই আমা দুগর জারত্ সুগ স্বর্গ
তুই আমা ঔই ভেই-বার নানান রঙঅর পদ্দাপুতি
বিষু তুই আমা বাক্কুনর পিয়ো-ধমা ।

বিষু তুই এলে আমি ঘিলা খেলা আর নারেং খেলা খেলি
তুই এলে ঘিংহুলিয়ানি রাধামন-ধনপুরী পালা গীত গাআন
বিষু তুই এলে গাবুজ্যা গাবুরী, মাঙ্ বাইন লক্কাআনি
সারা রাইত খুশীমনে জারিত ফি-অন
সে দিনানি বিষু তুই ন এলে আমি কী ফি পেবং?

বিষু তুই ন এলে রাধামন-ধনপুরী পালা, কুঞ্জধন-কুঞ্জবী পালা,
চান্দবী ভা মাছ্যা পালা আমি কি শুনি পেবং?
ফুল বিষু দিনা আমি ঘঅ-সাজে ফুল লই
মুল বিষু দিনা আমি বানে পাচন, সৌন্যা পিড়া, মু পিড়া,
চুইতচাং পিড়া খাবে গরবাই খুশী মনে
বিষু তুই ন এলে আমি কী পেবং সে খুশীআনি?

বিষু তুই আমা সিইঅত্ বৈসুক, সাংগ্রাই, বিঝু, বিহু,বিষু নানান নাঙে চেনা
সিঅ জগরে তুই আমা জুন্মো জারত্ ঐতিহ্য
থয়ে গিনান আমা বেয়াক পিয়ো-আনি
পুয়ান বছ বিদায় দিইনান নআ বছর-রত পিয়ো লই
জাতিভেদ ভুলি যেইনান আমি এক ঔই ।

বেয়াক জুন্মো জাতি গমফাপি ঔই আমি থেবং সমারে
সিঅ জগরে এ খুশী দিনত্ শবক খেবং আমি
বেয়াক্ক জুন্মো জাতি গেইবং সাম্যের গীত
আমি ন থেবং কোন জারত্ পর
তর ঐতিহ্য লইনান আমি থেবং জনম্ভর ।

য়ো-বো

অলবি তঞ্চঙ্গ্যা

তুমি অ-লা আমা আগাই-স সাত তারা,
রাইত দিন আমা আগাইসত জ্বলি থাগ-অ ।
বেয়াক সুখ দু-গ করা কই পি তমানে
তুমি আমা য়ো-বো
আসা আসা জিউ জিউ তমানে ।

য়ো-য়ো ত-এ রো কাওলোই মিলাই নপে
রাইত দিন করক কাম গয়-ত
ঘ-অ বেয়াক মানোইত্তুনয়ে কেনে সামালাইত
অলে ত-অহসুগে দুগে কাওরে নপাইত ।

বো-বো তুইরো আমা চিগোন পিত্তিমি-ত চান-তারা,
বেন্ন্যা অলে রাঙা গোই উইচ্যা রাঙা বেল ।
মারা ঘাম টেঙ-ত পেলাই করক কাম গয়-ত
অলে-নলে হাক্কন গোই জিয়ান-ন-পাইত ।

য়ো-বো তমানে আমি করক গমপায়
বুসাই নপি, কোই নপি, দেগাই নপি তমানে
তুমি আমা পিত্তিমিত সাগর -অ দক্ক্যা দাঙ-অ
ছাবা দিনাই বুট্টি গাইত ওই আ-গ ।
তমানে আমি মানি আমা রাজ্য-ত রাসা রানি
আমি অলং ওমানে মান্যা বানা দ্বি-বা গোই ঝি ।

ছাত্রী, মেডিকেল এসিষ্টান্ট, চিটাগাং ইনিষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজী ।

ন-আ বষ

অলনা তঞ্চঙ্গ্যা

ফাগোই- ন-আ ব বায়েত
সাইয়ো কাত্তিনতুন জা-অ ফুল-অ
সনা সনা বাইত নিগেত
সি লগে ম-মনানত্তো পিত্তঁ লাগেত।

কালা কালা কোগিলুনে মিরা র-এ গীত গাইতন
করক পিত্ত লাগেত
গাই-ছ পুয়ান পারানি ঝই পোইনাই
কুচি পারানি ন-আ গোই কগরেত।
সি লগে বেয়াক মন-দু:খানি পোই পেলাইবা পাক্ক্যা
বিষ পাত্তোয়াই আমানে ন-আ বষ আসেত্তে সি-খব দেত।

ফাগোইন, চৈত মাইত জাইনাই বৈশাখ মাইত নিগিবোসি
ঘিলা খেলা, নারেং খেলা, আ-করক কি খেলা খিলিবং,
নানা রঙে ঢঙে ন-আ বষ গুসি লবং।
সি পিত্তঁ-এ ম-মনান উয়েত্তে উনিজুনি
আসেত্তে আমা ন-আ বষ, ন-আ দিন।

ছাত্রী, বি.বি.এস (১ম বর্ষ)
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ

শিক্ষা জাদত মেরুদন্ড

কল্প রঞ্জন তনচংগ্যা

শু-ন তনচংগ্যা জা-দ ভাই বোনোন
শিক্ষা জাদত মেরুদন্ড শিক্ষাই জ্ঞান
উন্নত জীবন যাপন তা ব্যাইক কোনে চান
শিক্ষা ছাড়া ইকখিনা ন-ফাই সরমান
এককোর খেত গুরি বাল্লাই দেত
সরকার কদক কয়।
কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষা ছাড়া পারে হন চাষাই
কারিগরী ব্যবসা বানিজ্য হিসাব নিকাশ চাই
লেয়া পড়া শিক্ষা ছাড়া পারে হন বেধাই?
ক-দ দককেয়া হামগরে ইককিনা কম্পিউটারে
ব্যাইক কোনে শু-ন তনচংগ্যা জা-দ ভাই বোনোন
শু-ন মন দিনে
শিক্ষা জাদত মেরুদন্ড স-না ব্যাইক কোনে

ছাত্র, কর্ণফুলী ডিগ্রী কলেজ

মোন

রুমেল তনঞ্চঙ্গ্যা

যু-দি চা-বার চা-ইত
মোন- মুড়া
আ-মা সিদ্যিই আ-ইত
সাপছড়ি মোন আদামত,
ই-দি আ-হে চি-অন দ্বা-অর
মোন-মুড়া
আ-হে চি-অন দ্বা-অর
ছড়া-ছড়ি
আ- হর আ-হে বর মানুষ্য হাত্তান গরি
নানান পু-রান ইতিহাসর কদা।
ই-দি এলে দেঘিবে ......
দ্বি-বা মোড়া ছেড়ে মোনর আদামানি
আ-রহ দেখিবে.......
কাপ্তাই গাঙ চারিগাঙ, রাঙামাস্যা শ-আন
ব্যাক্কানি
ই-দি এলে বুজিবে
কদক দোল জাগানি
দি-সি গিলে জুড়াব
তর জামপালা পরানানি।

ছাত্র, একাদশ শ্রেণি,
কর্ণফুলী ডিগ্রী কলেজ

স্কুলট যেবং

রোজিনা তঞ্চঙ্গ্যা

আইস, আইস, ভাই বোইন লগ
ব্যাক্কুনে মিলিমিশি স্কুলট যাই
স্কুলট যাই নাই লেগা শিগিবং
ইয়ান আমি চাই।

আইস, আইস সমাশ্যা লগ
ব্যাক্কুনে একলগে স্কুলট যাই,
লেগা শিগিনাই মাইস্যা দেখ্যা
মানোইত অবং ইয়ান আমি চাই।

আমি অবং জাতির ভবিষ্যৎ
আমি রাগাইবং দেশর সম্মান,
দুইত নদেইয়া বাদে কাইয়ে আমি
অবান দিবং অপমান।

গরীব দুখ্যা মানোতমুনে যারা
গম নঅ পান, তা বিরুদ্দে গোইবং প্রতিবাদ
সমাজত শত্রু দেশর শত্রু
কাইয়ে আমি নগোই বং মাপ।

আইস আমি ব্যায়াক্কুনে এক সমারে
সবক কাবং
গম মনে, গম সমাজ
গম বাংলাদেশ বানিবং।

ছাত্রী, রাজস্থলী কলেজ

(হতাশা)

অগ্রবংশ ভিক্ষু

তোমার স্বপ্নের শহরে চাকরি নেই আজ-মা....
তোমার সন্তান আজ রাস্তায় ধুলোমাখা।
জানিনা নিঠুর দুনিয়া কি হবে...
শিক্ষার মান ওগো মা-নাই আর এই ভবে।
তুমি বড় আশাবাদী চাকরি করবে তোমার ছেলে!
তুমি তো জাননা মা'চাকরি এখন শুধু স্বপ্নে মিলে।
যে শিক্ষার মান আজ টাকা দিয়ে বিবেচনা করা হয়......
ঘুষ সারা চাকরি দেইনা মা'দুনিয়া আজ বড় হতাশয়।
আমি বড় হতাশা নেই আজ চাকরির আশা....
চাকরির নামে চলছে আজ রঙ্গীন তামাসা।,
বন্দি পাখি আজ উড়িয়ে দিলাম ওগো মা...
ছিলনা নাগো মান অভিমান"আমি বড়ই হতভাগা।
চার দেওয়ালে বন্দি আজ শিক্ষার মূল্য...
তুমি চিন্তা করো না মাগো"ঠিকই দেব তোমার মূল্য।
কত স্বপ্নে লালিত তোমার, ছেলের চাকরি হবে,
চাকরি কি পান্তা ভাত মাগো"যা সহজে দিবে।
কত ঘুরেছি কত কড়া নেড়েছি চাকরি দরজায়,
উকি মেরে চলে যায়-তবু আমি খুজে না পায়।
জানি স্বপ্নের শহরে আজ নেই চাকরির আশা..
ক্লান্ত হয়ে পরিলাম আজ আমি বড়ই হতাশা।

মাতৃভাষা

বোধি প্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা

বাংলা আমার রাষ্ট্রভাষা, মাতৃভাষা নয়;
বাংলাদেশে জন্ম আমার, আমি বাঙ্গালী নয়।

বাঙ্গালী একটি জাতিকে বোঝায়,
জাতীয়তাকে নয়;
শত শত জাতি নিয়ে জাতীয়তা গঠিত হয়।

লাল-সবুজের দেশে আছে,
শত রকমের ভাষা;
তাদের মধ্য "তঞ্চঙ্গ্যা" হল
আমার মাতৃভাষা।

"তঞ্চঙ্গ্যা" ভাষায় পড়তে,
লিখতে বড়ই ইচ্ছে জাগে;
মনে মনে ভাবতে থাকি
দেশটা স্বাধীন হোক আগে।

দেশটা স্বাধীন হলে হইত,
পাবো স্বাধীনতা;
তখন না হয় তুলে ধরবো
নিজেদের ভাষা,
সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যর কথা।

মুখে মুখে তারা সকলেই,
ভাষা রক্ষার কথা বলে;
কেড়ে নিতে চাই
আমাদের ভাষাকে
ছলে-বলে কৌশলে।

কি বা আছে আমাদের হাতে?
কে ই বা বলবে কথা?
বঙ্গদেশে জন্ম নিয়ে পায়নি
মাতৃভাষায় লেখাপড়া
করার স্বাধীনতা।

ছাত্র: কাঠামান্ডু বিশ্ববিদ্যালয়, নেপাল।

কোন এক দিগন্তে

রবিচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

কোন এক দিগন্তে
অজানার পথ পাড়ি দিতে
দাড়িয়েছি তোমার পাশে
একগুচ্ছ গোলাপ হাতে।

বলেছি তোমায়,
রজনী আসবে, উঠবে আকাশে রুপালি চাঁদ
জোনাকি পোকার ঝিলমিলিতে
ইচ্ছের মাঝে মিলবে দু-হাত।
তখন ভেবেছি আমি,
জীবনানন্দ দাশের অমর কবিতা
নাটোর বনলতা সেন
যার প্রেমে হয়েছি বিদিশার নিশা।
অতীতের স্মৃতি ভেবে,
আমার বিলুপ্ত হৃদয় যখন,
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে
আরো দূরে কক্ষ ও কক্ষান্তরে
পেয়েছি অসীম দুনির্বার বেদনা,
বলেছিলে তুমি
তোমার সমস্ত গ্লানি মুছে দাও
চলো দুজন পৃথিবীর সীমা রেখায়
এক স্বপ্নের অন্তরালে বিভোর হই.....

ছাত্র: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ইতি একটি প্রাণ

ধর্মচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

একটি স্বপ্ন, আকাশ সমান
আকাশে বাতাসে স্বাধীন সেই প্রাণ
সে প্রাণে ছিলো বেচে থাকার গান
আনন্দ অবিরাম।
মুখে হাসি ছিলো চোখেতে আশা
ছিলো মনে প্রাণে স্বপ্ন পিপাসা
যে পিপাসায় যে পেয়েছিল ত্রাণ,
শুধু হারিয়েছে প্রিয় প্রাণ।

আঁধার হতে আলো চেয়েছিলো,
শিক্ষা স্বপ্ন চেয়ে বসেছিলো।
এগিয়ে চলছিলো জীবন যেন,
ছিলো না কোন অভিমান।

হৃদয় বিদারক ছিলো এক রাত
আকাশে যেন এক কালো চাঁদ
অশুভ সেই চাঁদেই যেন
পেয়েছিলো এক লক্ষন।
গলার নিচে দা এর কোপ
বিছনায় যেন রক্তের স্রোত
এই স্রোত তবুও থামবার নয়,
মৃতদের কোন নেই পরিচয়
তাদের নিয়ে নেই কোন গান,
নেই কোন প্রতিবাদ।

ব্যানারে ফেষ্টুনে ভরিয়েছি পথ
তাদের নিয়ে কেউ করেনা শপথ
প্রতিবাদেও যেন দলাদলী
মৃত "ইতি" আজ পন্য

পন্য "ইতি" পন্য
তাই একটি জীবন শূন্য
অভিশপ্ত জীবন যেন,
হয়েছে আজ ধন্য।
নরপশুগুলো সব বেচে ফিরে যায়
আমাদের তবু অনুশুচনা নাই।
চারিদিকে শুধু নিরাশার ছাই
উড়িয়ে চলেছি আমারও।
সময় এসেছে চিৎকার চাই
চাই মুষ্টিবদ্ধ হাত,
জোষ্ঠ বেধে যদি পথে নামি তবে
দেখব সুপ্রভাত।

ছাত্র, নাট্যকলা বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

শূন্য পৃথিবী

মুক্তা আক্তার

মা গো ওমা!
তুমি তো আমার মা।
কেন আজ পাশে নেই
"বলো মা"
আজ আমার পৃথিবী মা,
শূন্য তোমার জন্য
ভয় হয়, অনেক ভয় হয়
এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে,
একলা একা জীবন আমার
"শূন্য পৃথিবীতে"
যে দিক তাকাই, সেদিক যাই
অবুঝ মনটি নিয়ে
অবুজ মনে চলতে গিয়ে
পাইনি খুঁজে পথ।
তারপরেও চলছি তো
জীবনের সন্ধানে।
সর্বশেষে খুজেঁ পেলাম
জীবন মানে কী?
আজ নয়তো কাল
যেতে হবে শূন্য পৃথিবী
ছেড়ে ওপারে।

ছাত্রী: এল.এল.বি
(৮ম সেমিষ্টার) সার্দান ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম।

একটা স্বপ্ন

ঈশ্বরচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

একটা স্বপ্ন
রাতের ঘুমকে তাড়া করে ফেরে।
কুয়াশার আবশা---
কখনো ঘন অন্ধকার এই রাত
সেই স্বপ্নটাকে উস্কে দেয়।
ঘুমহীন দু'টি চোখের পাতায়
জুড়ে বসে এক শান্তি ঝিরি।
ঝিরি শীতল হাওয়া
একটু আদর পেলেই
ঘুমিয়ে পড়ে মিনি শিয়রে
এক অদ্ভুদ আবেসে।
স্বপ্নটা যেন বিরতিহীন
ঘুরে ফিরে দরজায় টোকা দিয়ে যায়
এই স্বপ্ন শুধু
একটি কথা বলে,
কে আসবে জীবনে?

স্তব্ধ হয়ে আসে রাত
তবুও ঘুম নেই
একটা স্বপ্ন তাড়া করে ফেরে
বারেবার।

ছাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বান্দরবান সরকারি কলেজ

শুধু তোমারই জন্য

শান্ত বাবু তঞ্চঙ্গ্যা

শুধু তোমারই জন্য
একাকী উদাসমনে
জানালা খুলে দিয়ে
বসে পড়ি বারান্দায়
একটা কবিতা লিখবো বলে।

শুধু তোমারই জন্যে
রঙিন স্বপ্নগুলো আজ
দু'হাত নেড়ে স্বাগতম জানাই
বসন্তের কোকিলের সুরে সুরে
তুমি পাশে থাকবে বলে।

শুধু তোমারই জন্যে
আজও অপেক্ষায় কেটে যায় সময়ে
তোমারি পথ পানে চেয়ে
কারণ, তুমি কথা দিয়েছিলে আমায়
একদিন তুমি ফিরে আসবে বলে।

শুধু তোমরাই জন্যে
আজও রাত কাটে অনিদ্রায়
ভেসে উঠে তোমার স্মৃতিগুলো
মনে আঙিনায়
তুমি স্বপ্ন দেখিয়েছিলে বলে।
শুধু তোমারই জন্যে
একবুক ভালোবাসা নিয়ে।
অপেক্ষায় থাকি অধীর আগ্রহে
হঠাৎ এসে তুমি বলবে আমায়
ওগো। আজও রয়েছি আমি তোমারি হৃদয়ে।

চাকুরীজীবি
বিলাইছড়ি উপজেলা।

রাইনখ্যাং গাঙ

কালায়ন তঞ্চঙ্গ্যা

ছায়া সুনিবীড় বৈচিত্র্যে ভরা,
রাইনখ্যান গাঙ,
সেখানে পাবেন,
তঞ্চঙ্গ্যা জাতির সন্ধান
এখানকার তঞ্চঙ্গ্যারা আসে
মায়া মমতা আর ভালবাসায়।
রাইনখ্যাং গাঙের দু-কূল জুরে
তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামের সারি।
যে দিকে তাকায় চোখ জুড়ে যায়
মনে হয় যেন তঞ্চঙ্গ্যার স্বর্গভূমি।
যতদিন রবে রাইনখ্যাং গাঙ,
তুমিই বহমান,
তঞ্চঙ্গ্যা জাতি মনে রাখবে
তোমার অবদান চিরকাল।

ছাত্র, বিবিএ অর্নাস ৩য় বর্ষ (ব্যবস্থাপনা)
বান্দরবান সরকারি কলেজ

ভালবাসা

ঘুমপুরী তঞ্চঙ্গ্যা

স্বপ্নের ডানা মেলে
উড়ে চলে গাঙচিল
কখনোবা রোদ্দুর কখনো বা মেঘে
মাঠ প্রান্তর অনাবিল।
এলো মেলো হাওয়া দোলে
তরু ছাঁয়া শিখরে
দু'চোখ আঁকে, মনে ছবি ভাসে
তোমার ঐ পূর্ণিমা আধারে।

আবার ফিরে আসে
ঘুরে ঘুরে মনের মাঝে কতনা
স্মৃতির উত্তাল ঢেউগুলো
সন্ধ্যা তারার একাকি সাঁঝে।
এই তো সুখের পরশ মেলে
দু'জনের হৃদয়।

ছাত্রী, নার্সিং বিভাগ,
বিজিসি ট্রাস্ট কলেজ, পটিয়া

হারিয়ে যাবো একদিন

ধনরাজ তঞ্চঙ্গ্যা

ঝকঝকে তাঁরা গুলো এক সময় অদৃশ্য হবে...
ধুসর কালো মেঘে অন্ধকারে ঘিরে নিবে।
সমস্ত প্রকৃতি একদিন হারাবে তাঁর রুপ...
রাত্রে গভীর অন্ধকারে নেবে আছে নিশ্চুপ।
হারিয়ে যাবো মোরা রঙ্গিন দুনিয়া সেরে...
জীবন্ত প্রাণহানি কে নেবে যেন কেরে।
মৃত্যু ভয়ে সর্বদা ভীত জগৎ প্রাণীগণ..
না চাইলেও পাইতে হবে সেই অতৃপ্ত মরণ।
ধুসর কালো রঙ্গিন পৃথিবী বাঁচতে সকলেই চাই;
হাসি মাখা দিনগুলি আজ অনিত্যতাই।
ছিল নাকো হিংসা ভেদাভেদ মান অভিমান,
উলঙ্গ দেহ নিয়ে এসেছি -তবু খুজি মোরা সম্মান।
টগবগে যৌবন একদিন হারিয়ে যাবে
সেথা নয় কোন ভিটামিনের অভাবে।
মা বাবা ভাই বোন একদিন হয়ে যাবে একাকার,
শত কান্না আহাজানি করেও হবে না তোমার।
কচি কচি চামরা গুলি হবে একদিন জ্বরা জীর্ণ,
সমস্ত দেহ হানি হবে একদিন ছিন্নভিন্ন।
এই দুনিয়া এসে বলো আমরা কি পাবো?
কেননা, একদিন এই ধুসর দুনিয়া থেকে হারিয়ে যাবো।

ছাত্র: রাজস্থলী কলেজ।

রাইনখ্যং নদী

মিতালী তঞ্চঙ্গ্যা

তোমার অববাহিকায়,
যেখানে হাজারো মানুষ প্রাণ ফিরে পায়
সবাই তোমাকে একটি নামে ডাকে
রাইনখ্যং নদী।
প্রকৃতির সৌরভীত
সবুজ শ্যামল বনঘেরা পাখির কোলাহলে,
পূর্ণিমার চাঁদ যেখানে উৎস খুঁজে পায়,
সেই তুমি রাইনখ্যং নদী।
কষ্টের তীব্রতায়।
যখনি হারিয়ে ফেলি নিজের সত্ত্বাকে
তখনি তোমার জলধারায় উজ্জীবিত হই।
হে রাইনখ্যং নদী।
সত্যের পথ থেকে যখন বিচ্যুত হই।
নেমে আসে আধারের দ্বার।
মনে পড়ে তোমার চির অবদান।
ফিরে আসি আলো পথে
হে রাইনখ্যং নদী।

ছাত্রী, দ্বাদশ,
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ।

পূর্ণিমা রাত

মায়ারানী তঞ্চঙ্গ্যা

আজ খুব সুন্দর রাত
চাঁদ তার আলো দিয়ে।
আলোকিত করেছে সমস্ত পৃথিবীকে,
মনোরম পরিবেশে।
শান্ত চিত্ত পরিবেশে,
সবাই নিরব হয়ে গেছে।
আমি চাঁদের আলো নিচে,
একা একা বসে আছি।
মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায়।
অতীতে অনেক স্মৃতিগুলি,
অবুঝ মন অতীতে
স্মৃতি টানে যেতে চাই পিছু পানে,
মানুষ কি কখনো পিছনে দিনগুলোতে,
ফিরে যেতে পারে?
কখনো মনে পড়ে সে,
ছোট বেলার বন্ধু বান্ধবীকে।
কখনো মনে পড়ে প্রিয়জনকে,
মাঝে মাঝে এমন স্মৃতি মনে পড়ে যায়।
বুকে চাপা দিয়ে রাখা যায় না,
অতীতের স্মৃতিগুলো আজো আমায় কাঁদায়।

ছাত্রী, দ্বাদশ,
বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ।

একাকী পথ চলা

সুজলা তঞ্চঙ্গ্যা

এখনো অনেক একলা হাঁটতে
ইচ্ছে করে।
রোধ বৃষ্টির হাত ধরে
মেঘ যখন বৃষ্টি অনেক
টাপুর টুপুর- একলা মনে,
হাত ধরে, তার যাই হেঁটে
যাই মেঘের পরে দিনে দিনে
এখনো অনেক একলা হাঁটা
ক্ষনে ক্ষনে
আপন মনে।
বিকেল তখন আকাশ জুড়ে
একলা তারা অনেক দূরে
আপন মনে একতারা তার
মন খারাপি বাউল সুরে
তুলোর মত পেঁজা পেঁজা।

ফেলব ঘাসে হিমেল পায়ে-
দূর পেরিয়ে অনেক দূরে-
এখনো অনেক একলা হাঁটা
ইচ্ছে করে।

ছাত্রী, কর্ণফুলী ডিগ্রী কলেজ।

আদিবাসী জুম্ম প্রতিবাদী

সুচিত্রা তঞ্চঙ্গ্যা

হে আদিবাসী জুম্ম জনগন
তোমরা কেন এত দুর্বল?
তোমরা কেন এত স্বার্থপর?
বার বার কেন ভূলে যাও
আমরা নয় বাঙালী
আমরা আদিবাসী
মৃত্যু ভয়ে কেন ফিরে যাও
পিছু পানে,
নিজে স্বার্থে জন্য ভূলে যাও
নিজে জ্তাতি-জাতি কথা,
যাকে বলা হয়েছে
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এত বড় অপমান
ভূলে তোমরা কেন যাও
কখনো কি বুঝবে না
সত্যিকারে নিজে অধিকারের কথা
কখনো কি খুজবে না
নিজে জ্তাতি জাতি জয়ের কথা
যে দিন বুঝবে সেদিন কি থাকবে
এই আদিবাসী নাম?

ছাত্রী, দ্বাদশ বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ।

মায়ের মমতা

মনিকা তঞ্চঙ্গ্যা

মাগো, রঙিন এই পৃথিবী হতো নাকো দেখা
যদি তুমি না করতে মায়া
পারতাম নাগো মা প্রাণভরে নি:শ্বাস নিতে
যতি তুমি মমতার হাত বাড়িয়ে না দিতে
একটু একটু করে বেড়েছি যখন
স্নেহ মায়া মমতার ভরিয়ে দিয়েছো জীবন
তোমার মমতায় পাই গো মা বেঁচে থাকার প্রেরণ
শত কষ্ট পেলেও তুমি পর তবু করনা।

ছাত্রী, একাদশ, বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ

স্বপ্নের পথচলা

দীপা তঞ্চঙ্গ্যা

স্বপ্ন তুই দেখাও আলো
দেখাও পথ চলা।
তবুও তো স্বপ্ন সত্যি হয়
আবার কখনো মিথ্যা।
তবুতো স্বপ্ন দেখি মোরা
জীবন পথ চলায়।
স্বপ্ন তুই দিছ উঁকি
আমাদেরি চারপাশে
তোকে নিয়ে চলবো মোরা
এক পা দু-পা করে।
কেউ বলে স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে যায়
কিন্তু এমন স্বপ্ন যে আছে যা সত্যি হয়।
এভাবে চলতে স্বপ্নের পথ চলা
নিয়ে যাবে আমাদের বহুদুর দেশে।

ছাত্রী, একাদশ,
রাঙ্গামাটি সারকারি মহিলা কলেজ ।

তারুণ্যের জয়গান

সুনীল তঞ্চঙ্গ্যা

আমি দুরন্ত, আমি দুর্বার,
আমি মুক্তির সৈনিক।
পরাধীনতার বেড়াজালে-
থাকতে চাইনা আমি বন্দি।
মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে,
হিংসা হানাহানি ও মারামারি।
ক্ষমতার লোভে একদল নরপশু
নিয়ে যাচ্ছে সমাজ কে রসাতলে।
আসোক যত বাঁধা-বিপত্তি
দেখাক যত ভয়-ভীতি,
ভয় করি নাকো আমি-
যতদিন থাকবে তারুণ্যের শক্তি।
হাল ছাড়তে আমি নই রাজি
হয়তো একদিন দেখা মিলবে,
বুকের মধ্যে গেঁথে রাখা সেই-
স্বপ্ন আশার-আলোর বাণী।

ছাত্র, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

ভিনদেশী আগমন

আদর তঞ্চঙ্গ্যা

খোলা মেলা রাজ পথ
এপার ওপার ঘর,

ভিন দেশীর আগমনে
হয়ে গেল নগর।।
ঘনবসতি এখন এ নগর
রাজ পথও যে পূর্ন।
জাতি জাতি সঞ্চয়
ধর্ম ও যে ভিন্ন।

নিপীড়নের হাতে মরেছে
আদিবাসীর দল।
শাসন শোষন করেছে।
ভিন দেশীয় দল।

জাতি জাতি ভেদাভেদ
হয়ে আছে ভরপুর,
আদিবাসী হয়েও মোরা
নাম পেয়েছি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর তরুণ।
পারবো কী এই নাম শোধরাতে
পাবো কী স্বাধীনতা?
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হয়েও আছি
আদিবাসী মোরা

ছাত্র: একাদশ
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ।

আমার জীবনে তুমি

জবা তঞ্চঙ্গ্যা

তোমাকে খুব বেশি পাওয়া হয়নি জীবনে
যেটুকু পেয়েছি তাও আমার শূণ্য জীবনে
অনেক কিছু।
জীবনের মাঝখানে এসে খুঁজে পেয়েছি
তোমাকে
কতগর্ব আমার তোমার মতো সুশ্রীত বন্ধু
পেয়েছি আমি এ জীবনে
সে মিষ্টি মধুর হাস্য তোমার কথার কলকলানি
কত নীরব অশ্রু ঝরে আমর সব সময়ে পাশে থাকো তুমি
আমার সবকিছুকে ভালোভেসে থাকো সুখে-দু:খে
সবকিছুকে উজাড় করো আমায় ভালোবেসে
তোমার সে গভীর বন্ধুত্ব চির জাগরিত
ধন্য আমি তোমায় পেয়ে
ধন্য থাকবো চিরকাল
চিরকাল তুমি পাশে থাকে এই জীবনে চাই।

ছাত্রী: একাদশ (মানবিক)
রাঙ্গামাটি সরকারি মহিলা কলেজ।

আমরাই এদেশের আদিবাসী

মিসাইনু মার্মা।

এদেশের আদিবাসী
কেউ বলে ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা
কেউ বলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্টি।
কেউ বলে উপজাতি।
কিন্তু জেনে নিন,
আমরাই এদেশের আদিবাসী।
আছি মোরা এখানে,
থাকব চিরকাল।
এই ভূমি শুধু ওদের নয়
আছে অধিকার মোদের।
মোরা কেউ নয় পরবাসী
আমরাই এদেশের আদিবাসী।
আছে নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতি,
আছে নিজ নিজ ভাষা।
তবু কেন বলা হয়?
আমরা সবাই বাঙালী!
আমরা নই বাঙালী,
আমরা এক একটা জাতি
আমরা এদেশের আদিবাসী।

ছাত্রী: ৮ম শ্রেণি রাজস্থলী তাইতং পাড়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

শৈশব জীবন

জ্যোতি তঞ্চঙ্গ্যা

শৈশব জীবন কত না সুন্দর
জীবনটা ছিল তখন কবিতা ছন্দে মতন।
কখনো মিশে যায় পুতুলে খেলায়,
কখনো মিশে যায় মাঠের মেলায়।
গোধুলি বেলায় ফিরলে বাড়ি।
ক্লান্ত সুরে ডাকি মা গো বলে।
কতনা আদরের মা জড়িয়ে নেয় বুকে,
সব ক্লান্ত দূর হয়ে যায়।
মুক্ত পাখি মতন খোলা আকাশে,
মিলতো ডানা,
শৈশবে জীবনে ছিল না কোন বাধা,
ছিল না কোন ভাবনা।

ছিল না কণ্ঠে বুকে ভার,
সুখে ছিল মোর শৈশবে জীবনটা।

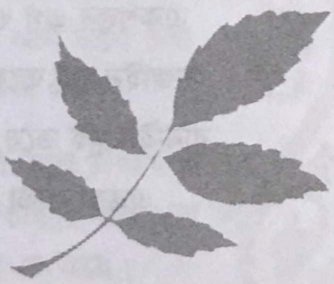
ছাত্র: অষ্টম শ্রেণি,
বিলাইছড়ি মডেল হাই স্কুল।

গাঙচিল

সোনাধন তঞ্চঙ্গ্যা

হে গাংচিল! তুমি উড়ো সীমাহীন আকাশে
পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র-নদী সবই থাকে তোমার নিচে।
বুক ভরা সাহস নিয়ে ঘুরে বেড়া ও পৃথিবীতে তুমি,
তোমার অসীম সাহস দেখে অবাক হই আমি।
হে গাঙচিল!
লক্ষ লক্ষ পাখির মধ্যে ভিন্ন তুমি সবে,
কঠোর পরিমশ্র আর অসীম সাহস দিয়ে শ্রেষ্ঠ তুমি ভবে।
শত শত মাইল উপরে উড়ে বেড়া ও তুমি,
তোমার জয়গানের গাথা গায় এই তোমার জন্মভূমি।
কালবৈশাখী ঝড়ে সবাইতো আশ্রয় খুঁজে,
তুমি শুধু ঝড়কে ভেদ করে উড়ো আকাশে
হে গাঙচিল!
হাজার হাজার মানুষ, তোমায় দেখে অনুপ্রেরণা পায়,
তোমার মতো অদম্য ইচ্ছাশক্তি যেন মানুষের বুকে থাই।

ছাত্র, ৯ম শ্রেণি
রেইছা উচ্চ বিদ্যালয়



তঞ্চঙ্গ্যা গান

বেল্লোয়া ঢুবিবো....

সাধন তঞ্চঙ্গ্যা

যক্কনে বেল্লোয়া ঢুবিবো
মনত উরে মত্তুন তয়ে
মনান কসালি গয়ে
তহ হাসিবা মনত উড়িলে
বুচাই নহ পঙত মুই তয়ে
গচি লহ ম-মনান
তাবে তুই করক দুয়ত (২)

চুগ কারিলে ও তয়ে
দেগং এ দিবা চুগত
হাস-ত ম ইন্দি চাই
মনান খুশি গোই উরে
তাবে তুই করক দুয়ত (২)

আশা আগে এ মনত
গুছি লবে ম-মনান
বাছাই তাই-ন সেরক দিন
যে রক দিন ন-বুছ-ত
তাবে তুই করক দুয়ত (২)

ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ
(অনার্স ৩য় বর্ষ)
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ।

তঞ্চঙ্গ্যা গান

নিরন তঞ্চঙ্গ্যা

কুরু গেলে মে পেলাই
কুরু আগইত তুই
কুরু গেলে পাইন তু-য়ে
বানা ভাবি তাং মুই।
আয়না ম সিরু, আয়না নয়া গুই..(২)
যক্কনে আলে ম-মনানত
কোনো সিরা নাই
সুগে সুগে দিনুন কারাই
একখেনা ভাবি ন সাই।
সিদিনুন কী নয়া গুই ফুরি উরিবাক.(২)
আস্যা মনান ম নমানে
এ মনান কিয়া ভাঙি দিলে
রাইসত পুর্ণিমা জুনান কিয়া
নয়াগুই ন জ্বলে
গমপানা কী ন বুসিলে
গমপানা কী ন মানিলে.(২)

ছাত্র, বিবিএ (ব্যবস্থাপনা ১ম বর্ষ)
বান্দরবান সরকারি কলেজ

তঞ্চঙ্গ্যা গান

ইমন তঞ্চঙ্গ্যা

সাজাইন মুই তয়ে, রাঙা রং লই নাই
বানাইন মুই তয়ে গমপানা লই নাই।
এক্কয়া লাভা পুরি মেলা-
চুবে চুবে লাসাই লাসাই
গমপানা দিলুং বানা তয়ে-(২)
ও ও ও বৈশাখ মাশত দেবা গুচে
তয়ে মনত উরিলেও
গয়ত প-য়ান ন টিঘে
করা কুবাত বানা মন মাগে
গম পানা ধু-বা বাইয়েরে-(২)
কুরু আগইত তুই কই নপং
ম-অ মনান কই পং
গমপানা হিসাব রাগাইয়ং।
একশত্তুন এগ ও যের নয়-(২)-ঐ
সাজাইন মুই তয়ে, রাঙা রং লই নাই
বানাইন মুই তয়ে, গমপানা লই নাই।
এক্কয়া লাভা পুরি মেলা-(২)

মুবাছড়ি পাড়া, রাজস্থলি উপজেলা

তঞ্চঙ্গ্যা বানা ধয়ানা (ধাঁ ধাঁ)

লাকী তঞ্চঙ্গ্যা , মায়রাণী তঞ্চঙ্গ্যা, সুচিত্রা তঞ্চঙ্গ্যা

১। তুই তাবে নালাত মুই তাইন ঝোবত লত-লয় আমি দেগা অবং মরণ অকালে
উত্তর : মাইত, মরইত।

২। এক বুজ্যা ডুগু বোরে বু-আ অয়ে
উত্তর : পুটিং গুলা।

৩। চুক নাই পেদা মানোইত খাই
উত্তর: জুগ।

৪। এক বুজ্যা ভাত খাই দি বুজ্যা চাই তাই।
উত্তর: আরু গিলা।

৫। চিং চিং বং বং জুগা পারি নিগং
উত্তর: ধান ছিরি।

৬। ব-অ চাদারাত উল পুরে
উত্তর- তারা।

৭। কালা ছাগলে কালা গাইত খাই
বেসেগা মারাত আবুসি তাই
উত্তর: কিচিক।

৮। মইত যেরন পাল পাল কুইট চালে নাই, পানি আন চালে গুলা।
উত্তর : চৈল, চালৈন পানি।

৯। পাইত ভাইয়ে তুলে চব্বিশ ভাইয়ে ঘিরে এক ভাইয়ে লড়া চড়া করে দজ্যা ময়ত-প-অয়ে।
উত্তর : আঙুল, দাঁত, জিল, পেত।

১০। দুইলে ধুয় পায়, চালে নদেগে।
উত্তর: কানানি ।

১১। চাবাইলে চাবা ন-অ যাই, গিলিলে গিলা যায়।
উ্ত্তর: পানি

১২। গ-অ আগে দ-আ নাই, মানোইত চালে পাল পাল ডাগিলে মাইত নাই।
উত্তর: অয়-মু-আ

১৩। দুধ নাই বুড়ি পু-আ পালায়।
উত্তর: কু-আ

১৪। কান-চাই-আন গু-এক পেত।
উত্তর: বালোইত।

১৫। ছ-আ বিরে পুন চি তাই।
উত্তর: ডুপ।

১৬। বর কলগত পাইত- আ বিরা।
উত্তর: অলৈনচাল, পা-আ ধলা।

১৭। লুরি টানিলে মোইন গ-ডায়।
উত্তর: চ-অ-গা।

১৮। হাইট অ-য়া ন-অ বাছে লেট্রান যারে বাছে।
উত্তর: দৌলোন।

১৯। গাইচ-অ-য়ে পানি কু-আ।
উত্তর: ডাপ

২০। শন চি চি সাপ যাই।
উত্তর: বাইন, বিয়ং।

২১। শাল আগে তলা নাই।
উত্তর: ছাড়ি।

ছাত্রী: বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ।

ধাঁ ধাঁ

শ্রীমতি তঞ্চঙ্গ্যা, এস.এস.সি পরীক্ষার্থী
সুচরিতা তঞ্চঙ্গ্যা, নবম শ্রেণি,

১। সআ-তুমত ভাঙা গঅ, আড়ু কুবি সালাম যঅ।
২। কালা বাইত বঅনত সুগঅ বেয়ানা।
৩। যঅ আগে দয়াত নাই, মানুইত আগন রঅ-স নাই।
৪। চাল আগে তলা নাই, পসা থুবাত জাগা নাই।
৫। চিগুনঅ লক্ষ্যে কাড়া, দাঙঅ উলে পারা।
৬। সেএলে নদেগে-দুল্লে দুই পাই।
৭। এক্কয় মুআ উরিউরি নজিনে।
৮। এক ছিরা ধানে গঅ ভয়ে।
৯। চাদারি জগরা উল ফুরে।
১০। সেএলে দেগে দুল্লে দুই নঅ পাই।
১২। চাইত ট্যাং উবা, কাউলত লেইত
১৩। কালা মংঅত, মালা ভাসে।
১৪। এক্কয়া গাইছত পাইতছুয়া টেলা।
১৫। সেএলে ববা চিবিলে কঅরা কয়।

উত্তর:
১। কাঙা গাত, (কাঁকড়ার গর্ত) ২। অগোইন, (উকুন) ৩। অই মুআ (উই পোকার বাসা) ৪। সাড়ি (ছাতা)৫। শন, (শন) ৬। কান, ৭। টিভি ৮। চেআক, (চেরাক) ৯। তারা ১০। বাত্তি পঅ, (লাইটের আলো) ১১। সাম্পান, ১২। দোলোইন (দোলনা) ১৩। চান (চাঁদ) ১৪। আত ও আঙুল। ১৫। মোবাইল, (হাত ও আঙ্গুল)

ছাত্রী: বিলাইছড়ি মডেল হাই স্কুল